প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত—জুন ১৯৮২

প্রহেলিকা-সিরিজের ২৪ নং গ্রন্থ

৪১০

boiRboi.net

নকলের হিমালয়

৮১০

শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

জুন
১৯৮২
৭

ছেপেছেন—
বি· সি· মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
টা. ৪·০০

boiRboi.net

উপহার

boiRboi.net

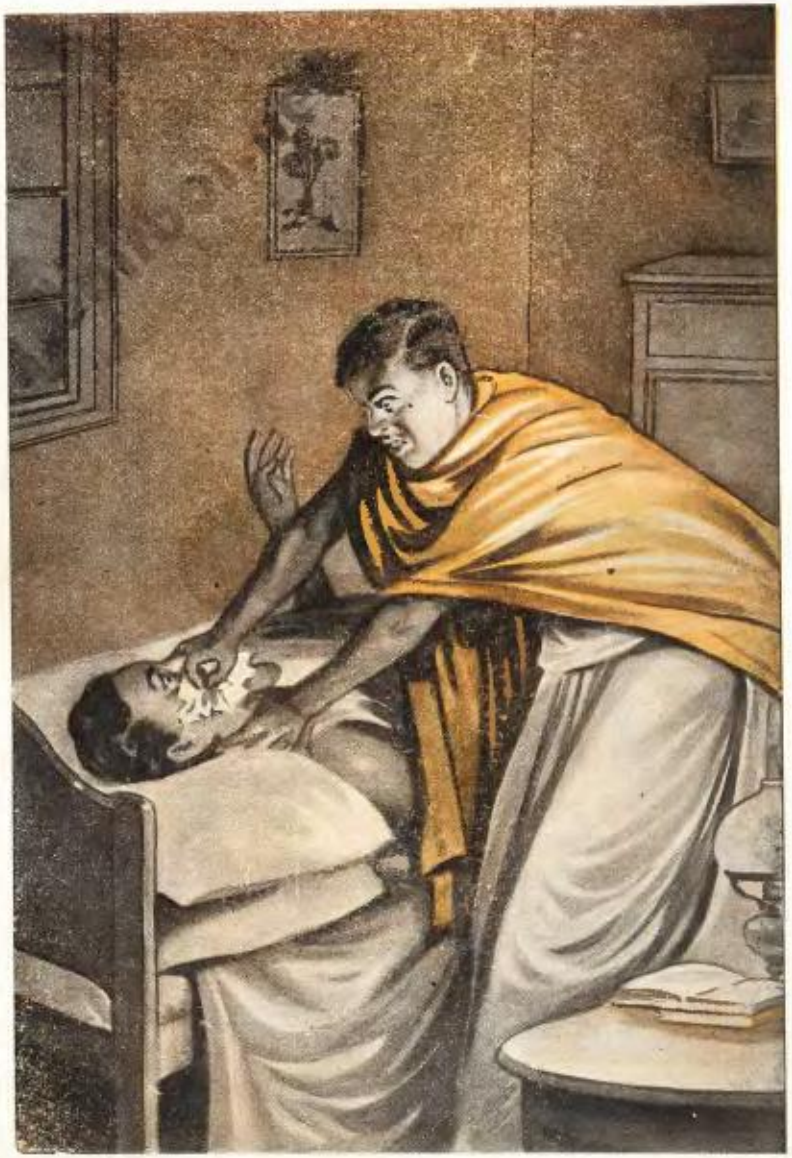

রুমালে ক্লোরোফরম ঢেলে নাকের কাছে চেপে ধরল।

৪৯০

boiRboi.net

স্থাপিত-১৯৮৬
ভা:-ডাবিয়া

নকলের হিমালয়

—:০:—

এক

গৌরীপুরের মহারাজার পদ্মরাগ-মণি চুরির কেসে শশাঙ্ক অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। সেই রহস্য ভেদ করতে তাকে পরিশ্রমও করতে হয়েছিল যথেষ্ট। শশাঙ্ক ঠিক করেছিল, এর পরে বেশ কিছুকাল সে পূর্ণ বিশ্রাম নেবে, কোন কাজে হাত দেবে না।

কয়েক দিন সে তার কথা রেখেও ছিল; কিন্তু সেই সময় এমন একটা ব্যাপার ঘটল, যার ফলে তার বিশ্রামের আর সুযোগ রইল না।

সেদিন ঘুম থেকে উঠতে বেশ খানিকটা বেলা হয়ে গেল। উঠে দেখি, শশাঙ্ক তার চিরাচরিত প্রথামত সোফায় বসে পাইপ মুখে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। আমাকে উঠতে দেখে বললে, "এই যে, উঠেছো তাহলে! এই খবরটা দেখ।" বলে তার হাতের কাগজটা এগিয়ে দিলে।

কাগজের মাঝখানটায় ছোট্ট একটা সংবাদ লাল পেনসিল দিয়ে দাগ দেওয়া। দিনের যে সব সংবাদ তার কাছে জরুরী মনে হয়, সেগুলি সে ঐ রকম দাগ দিয়ে রাখত। খবরটা এই—

লালগড়ের রাজা-বাহাদুর দর্পনারায়ণ রায়ের পুত্র কুমার কুণালচন্দ্র প্রায় ছয়মাস নিরুদ্দেশ। কুমার বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবার পরে

তার পিতাকে চিঠি লিখিয়া জানায় যে সে জীবনে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে, তাই সে আত্মহত্যা করিয়া সকল অশান্তির হাত হইতে উদ্ধার পাইতে চায়। রাজা-বাহাদুর তাহার অনেক অনুসন্ধান করেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এখন রাজা-বাহাদুর ঠিক করিয়াছেন, তাঁহারই এক দূর-সম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে পোষ্য গ্রহণ করিবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

পড়া হয়ে গেলে বললাম, "লালগড়ের রাজা-বাহাদুরকে তো তুমি চেনো?"

শশাঙ্ক বললে, "হ্যাঁ, আমার বাবা আর রাজা-বাহাদুর একসঙ্গে পড়তেন। আমি যখন ছোট ছিলুম, তখন দুই পরিবারে পরিচয়ও ঘনিষ্ঠ ছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে আর বেশী মেলামেশা নেই।"

তারপর একটু থেমে শশাঙ্ক আবার বললে, "শুধু খবরের কাগজের সংবাদটাই একমাত্র খবর নয়। এই দেখো"—বলে আমার দিকে একখানা খাম এগিয়ে দিলে।

দামী পুরু খাম। উপরে এক পাশে রাজা-বাহাদুরেরই মনোগ্রাম। চিঠিটা পড়লুম। রাজা-বাহাদুর লিখেছেন,—

কল্যাণীয়েষু শশাঙ্ক!

বহুদিন তোমাদের কোন খোঁজ-খবর নিইনি। আজ বিপদে পড়েই তোমাকে চিঠি লিখচি, আশা করি তোমার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হব না।

তুমি বোধহয় জানো যে, প্রায় দশ বছর আগে লালগড়ের রাণী অর্থাৎ কুণালের মা আমার বোন মণির সঙ্গে ঝগড়া করে বাপের বাড়ী চলে যায়; কিন্তু বাপের বাড়ী সে যায়নি। আমি বহু অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

কুণালের মা যখন যায় তখন কুণালের বয়স বছর বারো-তেরো হবে। সেই থেকে তার মায়ের অভাবও আমাকেই পূর্ণ করতে হয়েচে। কুণালও আমার অত্যন্ত বাধ্য ছেলে ছিল; কিন্তু গত মে মাস থেকেই তার ব্যবহারে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা দিতে থাকে। প্রায়ই সে আমাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করত। দেখা হ'লে মুখ ফিরিয়ে নিত। শুধু তাই নয়, তার শরীরেও এই সময় ভাঙ্গন ধরে এবং সঙ্গে-সঙ্গে মেজাজও ভীষণ খিট্‌খিটে হয়ে যায়।

তারপর জুলাই মাসে সতেরো তারিখে সে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়; সঙ্গে টাকাকড়ি, জামা-কাপড় কিছুই নেয়নি।

যতদূর মনে হয়, এক বস্ত্রে সে বেরিয়ে গেছে। তারই তিন-চার দিন পরে আমি ওর কাছ থেকে একখানা চিঠি পাই। তাতে সে লিখেছিল যে তার জীবনে আর শান্তির কোন আশা নাই; তাই আত্মহত্যা করেই সে সকল জ্বালা জুড়াতে চায়! আমি পুলিশ, প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ, বন্ধুবান্ধব অনেককে দিয়ে তার সন্ধানের চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোন ফল হয়নি।

তারপর ছ'মাস কেটে গেছে। তখন আমার বিশ্বাস হলো যে কুণাল সত্যই হয়ত আত্মহত্যা করেছে। অনেক ভেবে স্থির করলাম যে পোষ্যপুত্র নেবো। এতবড় একটা বংশের উত্তরাধিকারী কেউ থাকবে না, সেটা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে কত কঠিন, তা বোধহয় তুমি বুঝতে পারবে।

যাহোক, আমার পোষ্যপুত্র নেবার প্রস্তাবে আমার আত্মীয়-স্বজন—সকলেরই সম্মতি ছিল; কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল, কাকে পোষ্য নেওয়া যায়?

বোন মণি বিধবা। তার একটি ছেলে আছে সমর, কলকাতায় হোষ্টেলে থেকে পড়ে। মণির ইচ্ছা, তাকেই পুত্র হিসাবে গ্রহণ করি। তাহলে আর এতবড় সম্পত্তিটা হাতছাড়া হয়ে যায় না।

আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ধরণী প্রায় দশ বছর কাল ব্যবসা উপলক্ষে জাভায় ছিল। মাস-চারেক হলো সে কলকাতায় ফিরেছে। তার

ইচ্ছা, পোষ্য নিলেও সম্পত্তির অর্দ্ধেকটা তাদের দু'ভাইয়ের নামে লিখে দিই। তাতে আমার আপত্তি ছিল না এবং তার পরামর্শ-মত আমি প্রায় ওই মর্ম্মে এক উইল করি।

কুণালের মা চলে যাবার পর থেকেই আমার মনে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে কৌতূহল জাগতে থাকে। বিখ্যাত প্রেত-তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার ঘোষের নাম তুমি নিশ্চয়ই শুনেছো। এই উপলক্ষে আমি তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকাল পত্রালাপ করি।

তুমি জানো, ইয়োরোপ-আমেরিকার মত আমাদের দেশে প্রেত-তত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কোন গবেষণাই আজ পর্য্যন্ত হয়নি। আমার তাই ইচ্ছা, ডাক্তার ঘোষের তত্ত্বাবধানে যদি এই রকম কোন গবেষণাগার স্থাপন করা যায়, তাহলে দেশের সত্যিকারের উপকার করা হবে।

এ বিষয়ে ডাক্তার ঘোষের কাছে তাঁর মতামত চেয়ে আমি পত্র লিখেছিলাম। আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম, তাঁর হাতে দু'লাখ টাকা দিলে তিনি কাজ আরম্ভ করতে পারবেন কিনা।

ডাক্তার ঘোষ আমার প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন; কিন্তু আমার পরিবারের সবাই আমার এই ইচ্ছার বিরোধী। তারা আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। শেষটায় তারা জানিয়ে দিয়েছে যে, আমি যদি এই টাকা সত্যই ডাক্তার ঘোষকে দিই, তবে তারা আদালতের সাহায্য পর্য্যন্ত নিতে দ্বিধা করবে না। তারা প্রমাণ করবার চেষ্টা করবে যে, আমি আর প্রকৃতিস্থ নেই, তাই আমার দানপত্রও অসিদ্ধ। আমি ডাক্তার ঘোষকে আমার এখানে আসবার জন্য লিখে দিয়েছি। এ সম্বন্ধেও তোমার সঙ্গে পরামর্শ প্রয়োজন।

গতকাল আমি আমার এক দূর-সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্র মণ্টুকে পোষ্য নিয়েছি। সে সংবাদ কাগজে এখনও বেরোয়নি, এবং কাল সন্ধ্যার সময়ই কুণাল বাড়ী ফিরে এসেছে। এতে আমার পারিবারিক গ্রন্থি আরও একটু জটিল হলো।

তুমি আমার এই চিঠি পরশু অর্থাৎ রবিবার সকালে পাবে। আমি আশা করি, রবিবার রাত্রিতেই ঢাকা মেলে তুমি আমাদের এখানে আসবার জন্য রওনা হবে। ডাক্তার ঘোষও রবিবার ঢাকা মেলে লালগড় আসছেন। সোমবার সন্ধ্যায় তোমরা লালগড়ে এসে পৌঁছুবে। ষ্টেশনে গাড়ী হাজির থাকবে।

তুমি যাতে অবস্থার সম্পূর্ণ গুরুত্ব বুঝতে পারো, তারই জন্য সব কথাই বিস্তারিত লিখলাম। আমি একা আর চিন্তার ভার বইতে পারছিনে। আশা করি, কুশলে আছো। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
দর্পনারায়ণ রায়।

পড়া হয়ে গেলে বললুম, "আজই তো রবিবার। তুমি তাহলে লালগড়ে যাচ্ছো?"

শশাঙ্ক পাইপটা দুবার হাতের উপরে ঠুকে বললে, "শুধু আমি নয়, তুমিও যাচ্ছো। না না—কোন আপত্তি নয়। তোমাকে বাদ দিয়ে কোথাও যেতে পারিনে। রাজা-বাহাদুর সে কথা বুঝবেন। তুমি তৈরী হয়ে নাও। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র গুছিয়ে নিতে ভুলো না। আমি এখুনি একবার বেরুবো। ফিরতে হয়ত বেলা তিনটে সাড়ে-তিনটে হবে। ট্রেন তো দশটায়। না?" বলেই শেল্‌ফ্ থেকে টাইম-টেব্‌লটা বার করে দেখলে, ঢাকা মেইল ছাড়ে ন'টা বেজে পঞ্চান্ন মিনিটে।

আমি একবার বললুম, "তোমার বিশ্রামের কি হলো?"

শশাঙ্ক কপালে হাত দিয়ে বললে, "সবই অদৃষ্ট রে ভাই, সবই অদৃষ্ট!"

boiRboi.net

দুই

ট্রেন ঢাকা ষ্টেশন ছাড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই ভীষণ বৃষ্টি এলো। লালগড়ে যখন ট্রেন এসে থামলো তখন বর্ষা মারাত্মক হয়ে উঠেছে। ষ্টেশনে জনপ্রাণী নেই। প্রবল হাওয়ায় খোলা প্লাটফর্ম্মের ল্যাম্পগুলি সব নিভে গেছে। ষ্টেশন-মাষ্টার কোন মতে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন তাঁর ঘরে জ্বালিয়ে রেখেছেন।

আমরা দু'জনে সেই ঝুপঝাপ বৃষ্টির মধ্যেই ভিজতে-ভিজতে ষ্টেশনের চালায় গিয়ে উঠলাম। একটু পরেই গাড়ী থেকে আর একটি ভদ্রলোক বর্ষাতি গায়ে দিয়ে নেবে এসে চালার মধ্যে দাঁড়ালেন।

তাঁর মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে চশমা। মাথায় অল্প একটু টাক। বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে।

শশাঙ্ক আমাকে বললে, "নিশ্চয়ই ডাক্তার ঘোষ! আর কোন প্যাসেঞ্জার যখন গাড়ী থেকে নামল না, তখন ইনি ডাক্তার ঘোষ না হয়ে যান না।"

ভদ্রলোকটি আমাদের দিকে এগিয়ে এসে হাসিমুখে নমস্কার করে বললেন, "আপনারা ঠিকই ধরেছেন। আমিই ডাক্তার ঘোষ।"

আমি অত্যন্ত বিস্মিত বলুম; কারণ, শশাঙ্ক আমাকে এত আস্তে-আস্তে তার অনুমানের কথা বলেছিল যে, সেই ভদ্রলোকটির অতদূর থেকে শুনবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

শশাঙ্ক প্রতি-নমস্কার করে হেসেই উত্তর দিলে, "প্রথম সাক্ষাতেই আপনি আপনার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিলেন! আমার

নাম শশাঙ্ক সোম। আর ইনি আমার বন্ধু নিখিল বক্সী। আপনার এবং আমাদের উভয়েরই গন্তব্য স্থল এক—অর্থাৎ সবাই আমরা লালগড়ের রাজা-বাহাদুরের অতিথি।"

ডাক্তার ঘোষ খুসি হয়ে বললেন, "ভালই হলো দেখা হয়ে; কিন্তু আপনি যেটাকে অলৌকিক ক্ষমতা বললেন, আসলে ওটা অলৌকিক কিছু নয়। আপনার ঠোঁট-নড়া দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলুম আপনি কি বলছেন! এটা অসাধারণ কিছুই নয়, চেষ্টা করলে আপনিও পারেন।"

শশাঙ্ক বললে, "হয়ত পারি—হয়ত পারিনি। সে যাক্, এ সম্বন্ধে পরে কথা হবে। কিন্তু রাজা-বাহাদুরের গাড়ী তো কই দেখচিনে!"

ডাক্তার ঘোষ বললেন, "তাইতো! রাজা-বাহাদুর আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতেও গাড়ী পাঠাবার কথা ছিল। আসুন, ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে খোঁজ নেওয়া যাক্।"

ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কোন গাড়ীই আসেনি রাজবাড়ী থেকে। তবে তিনি আমাদের জন্য একটা গরুর গাড়ীর চেষ্টা করতে পারেন।

অগত্যা তাতেই রাজী হ'তে হলো। মাষ্টার-মশাই অফিসে তালা দিয়ে লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে গেলেন গাড়ীর খোঁজে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে একখানা গরুর গাড়ী পাওয়া গেল।

ষ্টেশন থেকে রাজবাড়ী প্রায় দেড় মাইল পথ। গাড়ী যখন রাজবাড়ীর গেটের বাইরে এসে দাঁড়ালো তখন রাত আটটা বেজে গেছে।

আমরা ব্যাগ নিয়ে নেবে পড়লুম। হঠাৎ তখন বিদ্যুৎ-চমকে একটা অদ্ভুত দৃশ্য আমার চোখে পড়ল!

রাজবাড়ীর গেটেই মস্তবড় একটা বটগাছ আছে। তার উপরে আমি একটা মানুষ দেখতে পেলুম। তার হাত-পা ভাল দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু তার মুখটা বিদ্যুতের আলোয় অত্যন্ত বীভৎস দেখাচ্ছিল। মুহূর্তের মধ্যেই প্রাণীটা সড়াক্ করে পাতার আড়ালে চলে গেল। সেই ভীষণ বৃষ্টির মধ্যে বিদ্যুতের আলোয় ওই রকম কিম্ভূত-কিমাকার একটা মুখ দেখে আমার গাটা কেমন যেন ছম্‌ছম্ করে উঠল!

ভাবলুম, শুধু কি আমি একাই ওই মূর্ত্তিটা দেখলুম? না আরও কেউ দেখেচে?—আমি পাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, ডাক্তার ঘোষ ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছেন।

গরুর গাড়ীর লণ্ঠনের আলো তাঁর মুখের উপরে এসে পড়েছে। তাঁর চোখে-মুখে এমন একটা ভয়ার্ত্ত ছাপ পড়েছিল যে আমার মনে আর সন্দেহ রইল না যে, তিনিও ওই লোকটাকে দেখেছেন। তাঁর সমস্ত মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে!

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলুম, "কি হলো আপনার ডাক্তার ঘোষ?"

ডাক্তার ঘোষ বোধহয় আমার কথা শুনতে পেলেন না।

শশাঙ্ক তখন তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি হঠাৎ অসুস্থ বোধ করছেন, ডাক্তার ঘোষ?"

প্রশ্নটা শুনে ডাক্তার হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন! তারপর সাম্‌লে নিয়ে বললেন, "অসুস্থ? না—হ্যাঁ, তা একটু অসুস্থ বোধ হচ্ছে।"

শশাঙ্ক বললে, "হঠাৎ এমনটা হল কেন? বৃষ্টিতে ভিজে বোধ-হয়? আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলুন।"

চলতে-চলতে ডাক্তার ঘোষ বললেন, "এই গেটের কাছে আমি আমার এক মৃত বন্ধুর প্রেতাত্মা দেখতে পেলুম। শশাঙ্ক বাবু, আপনি জানেন আমি প্রেততত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করি। আজ এই বাড়ীর কম্পাউণ্ডে ঢুকবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার গাটা কেমন যেন ছম্‌ছম্ করছে! এই বাড়ীর সঙ্গে নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল জড়িয়ে রয়েছে! আমার কথা আপনারা বুঝতে পারছেন তো?"

শশাঙ্ক প্রশ্ন করল, "আপনার বন্ধুর প্রেতাত্মা দেখেই কি আপনার এই সব কথা মনে হচ্ছে?"

ডাক্তার ঘোষ আমতা-আমতা করে বললেন, "অনেকটা তাই বটে। যারা ভৌতিক গবেষণা করে, তারা অনেক সময় ভবিষ্যৎ মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা বুঝতে পারে।"

সদর দরজা খোলাই ছিল। বাড়ীতে ঢুকতেই চাকর রামচরণ এগিয়ে এলো।

রামচরণ শশাঙ্ককে আগেই চিনত। তাই প্রণাম করে বললে, "আপনারা ভিজে একেবারে নেয়ে এসেছেন যে! গাড়ীতে আসেন নি?"

আমি বললুম, "গাড়ীতেই এসেছি বটে, তবে মোটর-গাড়ী নয়, গরুর গাড়ীতে।"

রামচরণ বিস্মিত হয়ে বলল, "সে কি! ললিত ড্রাইভার যে আপনাদের আনবার জন্য পাঁচটার সময়ই গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেছে! আপনারা ষ্টেশনে গাড়ীর খোঁজ করেছিলেন?"

শশাঙ্ক বললে, "খোঁজ করেছি বৈকি! রাজবাড়ীর কোন গাড়ী আজ ষ্টেশনে যায়নি।"

রামচরণ অবাক হলো খুব। বললে, "ভাবনার কথা তো! গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে গেল, অথচ—! আমি রাজা-বাহাদুরকে খবর দিচ্ছি; আপনারা ভিজে কাপড়-জামা ছেড়ে বসবার ঘরে যান। আপনাদের এত দেরী দেখে তিনি ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।"

রাজা-বাহাদুরের সঙ্গে দেখা হলো তাঁর বসবার ঘরে। শশাঙ্ক এবং আমি প্রণাম করলুম, ডাক্তার ঘোষ নমস্কার করলেন।

রাজা-বাহাদুর আমাকে দেখিয়ে শশাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওঁকে তো চিনতে পারছিনে শশাঙ্ক!"

শশাঙ্ক পরিচয় করিয়ে দিলে, "এটি আমার বন্ধু নিখিল বক্সী—বন্ধু এবং সহকর্ম্মী একাধারে দুই-ই।"

রাজা-বাহাদুর হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন, বললেন, "আজকাল তো আবার সাহেবী কায়দায় হ্যাণ্ডশেক করতে হয়!"

আমি বললুম, "না রাজা-বাহাদুর, আমরা এখনও অতটা একেলে হইনি।"

রাজা-বাহাদুর বললেন, "রামচরণের কাছে শুনলুম তোমাদের আনতে নাকি গাড়ী যায়নি! দেখ দেখি, কি দুর্ভোগ! কিন্তু ড্রাইভারেরই বা হলো কি? সে গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছে পাঁচটায়, আর এখন রাত প্রায় নটা। ভারি আশ্চর্য্য তো! এইটুকু তো পথ, যেতে-আসতে আধঘণ্টার বেশী কিছুতেই লাগা উচিত নয়। নেশা-টেশাও করে না যে তাতে কোথাও আটকা পড়বে। ভারী ডিউটিফুল লোক আমার ড্রাইভারটি। অথচ আজ কি হলো!"

শশাঙ্ক বললে, "পুলিশে খবর দিয়েছেন?"

রাজা-বাহাদুর বললেন, "না—আমি জানতেই তো পারলুম এখন।"

তারপর রামচরণকে ডেকে বললেন, "তুই পিসীমাকে খাবার বন্দোবস্ত করতে বলে থানায় গিয়ে খবরটা দিয়ে আয়, কেমন?"

রামচরণ ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে চলে গেলো।

খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই এসে লাইব্রেরী-ঘরে বসলুম।

রাজা-বাহাদুর তাঁর পরিবারের সবাইকে ডেকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মণ্টু, ধরণীবাবু, রাজা-বাহাদুরের ভাগ্নে সমর—মণি পিসীমা—সবাই এলেন। এলো না শুধু কুণাল।

রাজা-বাহাদুর মণ্টুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কুণাল কি করচে রে?"

মণ্টু বললে, "দাদার মাথা ধরেচে, শুয়ে আছে।"

রাজা-বাহাদুর ও-সম্বন্ধে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন না। বিদ্রোহী পুত্রের প্রতি এখনও তার অভিমান আছে।

বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। কুণালের প্রসঙ্গ উঠতে সবাই কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন!

পরিচয়-পর্ব্বের মধ্যেই ডাক্তার ঘোষ কি কাজে অল্পক্ষণের জন্য তাঁর নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি এমন নাটকীয় ভঙ্গীতে এসে ঢুকলেন যে, সবাই চমকে উঠলুম।

রাজা-বাহাদুর প্রশ্ন করলেন, "কি ব্যাপার ডাক্তার ঘোষ?"

একটুকাল চুপ করে থেকে ডাক্তার ঘোষ বললেন, "আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, এই বাড়ীতে

কোন অশুভ আত্মা ভর করেছে। নিশ্চয়ই এখানে কোন অমঙ্গল ঘটবে।"

রাজা-বাহাদুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন; বললেন, "অমঙ্গল! কি অমঙ্গল ডাক্তার ঘোষ?"

—"কি অমঙ্গল তা আমি এখন বলতে পারছিনে। যাঁরা প্রেততত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁরা অনেক ব্যাপারে যোগদৃষ্টি লাভ করেন। তাঁরা ভবিষ্যৎ মঙ্গল-অমঙ্গল অনেকটা আগে থেকেই বুঝতে পারেন। আপনারা একে ইংরেজীতে বলতে পারেন Clairvoyance."

এবারে শশাঙ্ক প্রশ্ন করলেন, "দিব্য দৃষ্টির কথা বলছেন? আপনি নিশ্চয়ই কোন প্রেতাত্মার সাহায্যে বলতে পারেন, কি ধরণের অমঙ্গল আসতে পারে? আমাদের মধ্যেই কাউকে মিডিয়াম করে আপনি আত্মা আনবার পরীক্ষা করুন না!"

ডাক্তার ঘোষ আমতা-আমতা করে বললেন, "দেখুন শশাঙ্কবাবু, এই জাতীয় পরীক্ষা যত কম করা যায় ততই ভাল। তাছাড়া, শুধু স্বার্থের প্রয়োজনে যেখানে প্রেতাত্মা আনানো হয়, সেখানে প্রায়ই পরীক্ষা সফল হয় না। অনেক সময় অনেকক্ষণ ধৈর্য্য ধরে থাকতে হয়।"

মণ্টু বললে, "তা হোক আমরা ধৈর্য্য ধরতে রাজী আছি এখন আপনি রাজী হলেই হয়।"

রাজা-বাহাদুরও এই ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করে বললেন, "প্রেতের সাহায্যে যদি সত্যিই ভবিষ্যৎ জানা যায়, তাহলে ডাক্তার ঘোষ আপনি আমার ড্রাইভারের খবরটা জেনে দিন। লোকটা

"শশাঙ্কবাবু! এই আমার মায়ের কঙ্কাল!—"

boirboi.net

চার-পাঁচ ঘণ্টা হলো বেরিয়েছে, অথচ এখনও ফিরবার নাম নেই। কি বিপদ হলো, কে জানে!"

রাজা-বাহাদুরের অনুরোধে ডাক্তার ঘোষ আর 'না' বলতে পারলেন না। তিনি অনেকটা হতাশ ভাবে চারদিকে তাকিয়ে বললেন, "কোন ভৌতিক পরীক্ষায় মিডিয়াম করা সম্বন্ধে আপনাদের একটা কথা বলতে চাই।

প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে অপরের মনের একটা যোগ আছে। কোন-কোন ক্ষেত্রে সেটা নিবিড়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিথিল। যিনি পরীক্ষা করবেন এবং যিনি মিডিয়াম হবেন, তাঁদের পরস্পরের মনের যোগ যদি নিবিড় হয়, তাহলেই পরীক্ষা সফল হবার আশা থাকে।"

তারপর একটু থেমে আবার বললেন, "এখানে আপনারা যত লোক আছেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র মণ্টু বাবুর সঙ্গেই আমার নিবিড় আত্মিক যোগ আছে বলে মনে হচ্ছে। যদি আমাকে এইরকম কোন পরীক্ষা করতেই হয়, তাহলে মণ্টুবাবুকেই আমি মিডিয়াম হিসাবে বেছে নেবো। মণ্টুবাবু, আপনার আশা করি তাতে আপত্তি হবে না?"

মণ্টু প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে জানালে, "না, না, আপত্তি হবে কেন? আমি এক্ষুণি রাজী।"

ডাক্তার ঘোষ ঈষৎ হেসে বললেন, "ঠিক এক্ষুণি তো হতে পারবে না মণ্টুবাবু! কোন পরীক্ষা করতে হলে তার অন্ততঃ বিশ-পঁচিশ মিনিট আগে থেকে মনটাকে স্থির করে আনতে হয়। সে জন্য আমাকে একটু নির্জ্জনে বসতে হবে।"

তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা বরং আধ-ঘণ্টাখানেক গল্পগুজব করুন, আমি ততক্ষণ আমার ঘরে গিয়ে নিজেকে

প্রস্তুত করে নেই। এতে আশা করি আপনাদের কারু আপত্তি নেই?"

আমি বললুম, "আপনাদের কিছুক্ষণ যখন দেরীই আছে, আমি বরং ততক্ষণ গেটের কাছে একবার ঘুরে আসি, দেখি যদি সেই শয়তানটার দেখা মেলে!"

রাজা-বাহাদুর আপত্তি জানিয়ে বললেন, "এই জল-কাদার রাত্রি, বিপদের মধ্যে যাওয়া ঠিক নয় নিখিল! অবশ্য জানি যে, বিপদের মাঝেই তোমাদের জীবন। একান্তই যদি যাওয়ার দরকার হয় সঙ্গে একজন চাকর যাক্।"

আমি হেসে তাঁকে নিরস্ত করে বললুম, "আপনার ভয় নেই। আমি একাই যেতে চাই। বেশী লোক দেখলে লোকটা পালিয়েও যেতে পারে।"

রাজা-বাহাদুর আর আপত্তি করলেন না। আমি টর্চ্চটা নিয়ে লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে তখনও ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বাতি না জ্বেলেই পা টিপে-টিপে গেলুম গেটের দিকে। জমাট অন্ধকার—মাঝে-মাঝে দু'-এক জায়গায় রাজবাড়ীর খোলা জানলা দিয়ে সামান্য আলো বেরিয়ে আসচে।

হঠাৎ মনে হলো, দূরে ঝোপটার কাছে যেন অস্পষ্ট একটা ছায়া সরে গেল! সেদিকে যাবার জন্য যেই ঘুরে পা বাড়িয়েছি, অমনি একটা লোকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল। টর্চ্চের আলোতে দেখলুম, সেই লোকটাই!

লোকটা কিন্তু ধাক্কা খাবার সঙ্গে-সঙ্গেই গেটের দিকে দৌড় দিল। আমি পেছন থেকে চীৎকার করে বললুম, "পালাবার চেষ্টা করেছো কি গুলি করব।"

লোকটা থমকে দাঁড়াল। কিন্তু আমি ওর কাছে পৌঁছাতেই সে অতর্কিতে আমার চোয়ালের উপর দারুণ এক ঘুষি বসিয়ে দিল। আমিও সঙ্গে-সঙ্গে চোখে সর্ষেফুল দেখে কাদার উপরেই পড়ে গেলুম।

আঘাতটা এতই অতর্কিতে এবং প্রবল ভাবে এসেছিল যে, আমি বোধ হয় কিছুক্ষণ অভিভূতের মত কাদার উপরেই পড়ে ছিলুম। একটু সামলে নিয়ে যখন উঠে দাঁড়ালুম তখন দেখি, লোকটা চলে গেছে। কিন্তু তখনই মনে হলো, আমার পাশে কে যেন এসে দাঁড়াল! টর্চ্চের আলোতে চিনতে পারলুম তিনি ডাক্তার ঘোষ!

ডাক্তার ঘোষ উদ্বিগ্ন ভাবে বললেন, "আপনার কোন আঘাত লাগেনি তো নিখিলবাবু?"

হঠাৎ ডাক্তার ঘোষকে সেখানে দেখে আমার মনে কেমন যেন একটা বিরক্তির ভাব এল! আমি বললুম, "সে অতি সামান্য। কিন্তু আপনি এখানে হঠাৎ—?"

তিনি আমতা-আমতা করে বললেন, "আমি—তা আমি এখানে—আপনার তাহলে আঘাত বিশেষ কিছু লাগেনি?"

আমি আবার প্রশ্ন করলুম, "আপনি কেন এখানে এসেছেন সে কথা তো বললেন না?"

ডাক্তার ঘোষ দু'একবার কেশে গলাটা সাফ করে নিয়ে বললেন, "আপনাকে তাহলে খুলেই বলি। আপনি তো বাইরে চলে এলেন, আর আমি গেলুম আমার ঘরে, যাতে নির্জ্জনে বসে মনটাকে স্থির

করে নিতে পারি। কিন্তু যতবার মন স্থির করতে চেষ্টা করেছি, ততবারই মনে হয়েছে আপনার যেন কোন অমঙ্গল ঘটেছে! শেষটায় মনের অস্থিরতা এতটা বেড়ে গেল যে, আর বসে থাকতে পারলুম না; আপনার কাছে ছুটে এলুম।"

ডাক্তার ঘোষকে ওখানে দেখে আমার মনে কেমন একটা অহেতুক জ্বালা এসেছিল, তা এখনও যায়নি! তাই বিরক্ত সুরেই বললুম, "আপনি কি সবার মঙ্গল-অমঙ্গলের খবর আগে থাকতেই জানতে পারেন?"

—"না।" তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, "দু-এক সময়, দু-একজনের সম্বন্ধে মনে এ-রকম অস্থিরতা আসে। যা হোক, আপনার যে কোন আঘাত লাগেনি এই যথেষ্ট।"

—"না, আঘাত আমার লাগেনি; কিন্তু লোকটাকে কি আপনি দেখতে পেয়েছিলেন?"

ডাক্তার ঘোষ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "কোন্ লোকটার কথা বলছেন? আপনি কি কোন লোক দেখেছেন? কে, আমি তো আপনাকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাইনি! কিন্তু আপনি কি সত্যি-সত্যিই কোনও লোক দেখেছেন?"

তারপর একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে বললেন, "আপনার মনের ভুলও তো হতে পারে!"

—"ভুল বলছেন আপনি কাকে? ঘুষির চোটে যে আমার চোয়ালটা ফুলে উঠেছে, সেটা তো আর ভুল নয়!"

যাহোক্, সেই বৃষ্টি এবং অন্ধকারের মধ্যে লোকটাকে খুঁজে বার করা অসম্ভব মনে করে আমরা বাড়ীর দিকে পা বাড়ালুম। কিন্তু

যেতে-যেতে কেন যেন আমার মনে হলো, ডাক্তার ঘোষের মনের অস্থিরতা বাজে কথা। তিনি আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছেন।

ঈশ্বর জানেন, কেন আমার এই অদ্ভুত বিশ্বাস হলো!

তিন

লাইব্রেরী-ঘরে ফিরে আসতে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল, এবং সবাই প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করতে লাগলেন, "কি হয়েছিল? লোকটা কি করে পালাল?"—এম্‌নি সব প্রশ্ন।

আমি সবই বললুম। রাজা-বাহাদুর ব্যস্ত হয়ে বললেন, "তখনই বলেছিলুম গোঁয়ার্তুমি করতে যেয়ো না। তা তোমরা আজকালকার ছেলে, বুড়োদের কথা তো শুনবে না। যাক্, রামচরণকে বলে দিচ্ছি, জল গরম করে নিয়ে আসুক, সেঁক দিয়ে দেবে।"

শশাঙ্ক ঘাড় নেড়ে বলল, "কিছু দরকার নেই। ওর চোয়ালের ব্যথা আপনিই সেরে যাবে।"

তারপর ডাক্তার ঘোষের দিকে ফিরে বলল, "তার চাইতে ডাক্তার ঘোষ বরং তাঁর পরীক্ষাটা আরম্ভ করুন। রাত কম হয়নি, প্রায় দশটা বাজে।"

ডাক্তার ঘোষ আর বিশেষ আপত্তি না করে বললেন, "মণ্টুবাবু, তাহলে আসুন! হ্যাঁ, সামনের এই ছোট টুলটার উপরে বসুন।"

মণ্টু সামনের টুলটার উপরে বসল, আমরা সবাই একটু দূরে তাকে ঘিরে বসলুম।

ডাক্তার ঘোষ আবার বললেন, "দেখুন, আপনাদের হয়ত

একেবারেই নিরাশ হতে হবে! আমি যে সফল হবই, এমন কথা বলতে পারিনে।"

তারপর মণ্টুর দিকে ফিরে বললেন, "মণ্টুবাবু, আপনি রেডি?"

মণ্টু ঘাড় নেড়ে জানালে সে প্রস্তুত।

ডাক্তার ঘোষের ইচ্ছামত বড় বাতিটা নিভিয়ে দেওয়া হলো। একটা অল্প পাওয়ারের নীল বাতি ঘরের এক কোণে জ্বলতে লাগল।

বাইরে তখন উন্মত্ত ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডব চলছে। ক্রুদ্ধ বাতাস প্রবল বেগে প্রাসাদের দরজা-জানালার উপর আঘাত করছে। মনে হচ্ছে, যেন একটা ক্ষিপ্ত দানব পৃথিবীটাকে ভেঙ্গে-চুরে একাকার করে দিতে চায়, আর বাড়ীটার কাছে এসে বাধা পেয়ে সে শোঁ-শোঁ করে চাপা নিঃশ্বাস ফেলচে!

ডাক্তার ঘোষ মণ্টুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "শরীরটাকে যতটা পারেন আলগা করে দিন। চোখ বন্ধ করুন। হ্যাঁ—যদি ঘুম পায়, জেগে থাকতে চেষ্টা করবেন না, ঘুমিয়েই পড়বেন।"

কথাটা বলে তিনি মণ্টুর কপালটা দুহাতে ঢেকে দাঁড়ালেন।

মণ্টু একটু বিচলিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ডাক্তার ঘোষ, আপনি কি আমাকে হিপ্নোটাইজ্ করতে চান?"

ডাক্তার অত্যন্ত শান্তভাবে বললেন, "না-না, হিপ্নোটাইজ্ করব কেন? আপনি ভয় পাবেন না।"

ডাক্তার ঘোষ পুরো দশ মিনিট মণ্টুর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তারপর মনে হলো মণ্টু যেন আস্তে-আস্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌ছে।

হঠাৎ ডাক্তার ঘোষ দু'পা পিছিয়ে গেলেন। মণ্টু তেমনি স্থির

হয়ে বসে আছে। ডাক্তার অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, "আমার মনে হয় মণ্টুবাবু সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছেন।"

শশাঙ্ক প্রশ্ন করল, "অর্থাৎ আপনি বলতে চান, যে এখন ওর বাইরের চেতনা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে?"

—"হ্যাঁ।"

—"এখন তাহ'লে ওর উপর আত্মার আবেশ হতে পারে?"

—"দেখা যাক্", ডাক্তার ঘোষ অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললেন।

তারপর আবার সামনে এগিয়ে গিয়ে তিনি মণ্টুর দিকে ফিরে বললেন, "মণ্টুবাবু, আপনি কিছু শুনতে পাচ্ছেন? কারু কথা আপনার কানে আসছে?"

মণ্টু চুপ। দশ মিনিট, পনেরো মিনিট, পঁচিশ মিনিট নিঃশব্দে কেটে গেল। মণ্টুর কোন সাড়া নেই। সে ধ্যানী বুদ্ধের মত সেই রকম স্থির হয়েই বসে রইল।

আমার মনে পড়ল, ডাক্তার বলেছিলেন যে, এসব পরীক্ষায় অসাধারণ ধৈর্য্যের দরকার। তাড়াহুড়া করলে কিচ্ছু হয় না। আমাদের কারুরই যে ভৌতিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন বিশ্বাস ছিল তা নয় তবে মনে-মনে সবাই অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলুম। সবারই মনের ভাব "কি হয়! কি হয়!"

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ স্বর কানে এলো। মণ্টু কথা বলচে—

—"মালতী—মা আমার!"

মণ্টু এমনভাবে কথাটা উচ্চারণ করলে যে আমি প্রায় চমকে উঠেছিলুম!

মণ্টু আবার বলতে সুরু করল, "মালতী, আমি তোর সঙ্গে কথা

কইতে কত চেষ্টা করেছি! আমার কথা কি তোর কানে যায় না? আমি তোকে কত ডাকছি!"

ডাক্তার চারদিকে তাকিয়ে বললেন, "এ-বাড়ীতে মালতী বলে কেউ আছে?"

একটুকাল চুপ করে থেকে শেষে পিসীমা বললেন, "হ্যাঁ, আমাদের একটা ঝি-এর নাম মালতী।"

রাজা-বাহাদুর অত্যন্ত বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, "ভারী আশ্চর্য্য তো! মালতীর মা মাস-দুয়েক হলো মারা গেছে।"

ডাক্তার ঘোষ বিজয়-গর্ব্বে একবার চারদিকে তাকালেন।

"মালতী!" মণ্টু আবার বলতে লাগল, "তোর বাবার খোঁজ নিস্‌নে কেন মা? সে বুড়ো অসুখে মরছে! তুই তার খোঁজ নিস্, তার কাছে চিঠি লিখিস্।—ওরে, সে তোর বাপ, তার উপর কি রাগ করতে আছে!—"

রাজা-বাহাদুর বাধা দিয়ে বললেন, "একটু দাঁড়ান! আমি মালতীকে ডেকে আনছি।"

রাজা-বাহাদুরের ভাইপো ধরণীবাবু উষ্ণভাবে বলে উঠলেন, "এর মধ্যে আবার মালতীকে কেন?"

রাজা-বাহাদুর তাঁর কথা গ্রাহ্য না করেই বাইরে চলে গেলেন।

হঠাৎ ধরণীবাবু কেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বোঝা গেল না। তিনি প্রায় চীৎকার করেই বলে উঠলেন, "ডাক্তার ঘোষ! আপনারা দুজনে মিলে আমাদের কি বোঝাতে চাইছেন? আপনি কি বলতে চান রাজবাড়ীতে আজ ভূতের আবির্ভাব হয়েছে? যত সব আজগুবি কথা!" এই বলে তিনি গজ্-গজ্ করতে লাগলেন।

ডাক্তার ঘোষ শান্তভাবেই বললেন, "আমরা আপনাকে কিছুই বিশ্বাস করতে বলছিনে ধরণীবাবু! তাছাড়া মণ্টুবাবু এখন সম্পূর্ণ অচেতন।"

—"মণ্টু যে অচেতন সেকথা তো আপনিই শুধু বলছেন!"

ডাক্তার ঘোষের চোখ দুটো একবার যেন জ্বলে উঠল! কিন্তু তিনি বাইরে উত্তেজনার কোন চিহ্নই দেখালেন না! শুধু বললেন, "বেশ, আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।"

—"কি পরীক্ষা করে দেখব?"

—"ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখুন। কোন লোক অচেতন হলে তার চোখের তারা অত্যন্ত বিস্ফারিত হয়।"

ধরণীবাবু তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা করতে রাজী হয়ে গেলেন! বড়-বড় পা ফেলে তিনি মণ্টুর দিকে এগিয়ে গেলেন। শশাঙ্ক এবং আমিও পেছনে-পেছনে গেলুম।

ধরণীবাবু আঙ্গুল দিয়ে মণ্টুর চোখের পাতা তুলে ধরলেন। তার চোখ স্থির, নিশ্চল। তারা দুটো অত্যন্ত বিস্ফারিত।

ধরণীবাবু অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে এলেন।

আবার কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটল। তারপর ডাক্তার ঘোষ মণ্টুর দিকে ফিরে বললেন, "আর কারুর কথা শুনতে পাচ্ছেন? ললিত ড্রাইভার কি আপনাকে কিছু বলতে চায়? ভাল করে শুনুন!"

হঠাৎ দেখলুম মণ্টু যেন একটা অকথ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে! তার প্রশান্ত মুখ বারবার কুঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল। ঠোঁট দুটো কয়েক-বার কি যেন বলবার জন্য কেঁপে-কেঁপে উঠল! তারপর হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, "ওগো, আমি যে আর সইতে পারিনে!"

তার বেদনার্ত কণ্ঠস্বরে আমরা কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লুম, শশাঙ্ক চেয়ারের উপরে ঋজু হয়ে বসল।

মণ্টু বলতে লাগল, "ওগো, তুমি সাড়া দিচ্ছ না কেন?"

রাজা-বাহাদুর এতক্ষণে মালতীকে নিয়ে ফিরে এসেছেন। তিনি হঠাৎ কেমন বিচলিত হয়ে উঠলেন! কম্পিত স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি—আপনি কে?"

—"আমাকে চিনতে পারছো না? আমি সরোজিনী, এই রাজ-বাড়ীর এককালে রাণী ছিলুম আমি।"

রাজা-বাহাদুরের মুখ ছাইএর মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল! তিনি কি যেন বলবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন! কিন্তু একটা অস্ফুট শব্দ ছাড়া আর কোন কথাই তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল না। একটা মানসিক উত্তেজনায় তাঁর সারা দেহ থর্-থর্ করে কাঁপতে লাগল।

রাজা-বাহাদুরের চিঠিতে দেখেছিলুম, রাণীমা মণি-পিসীমার সঙ্গে ঝগড়া করে বাপের বাড়ী চলে যান। সে প্রায় বারো বছর আগেকার কথা। কিন্তু সেই থেকে তাঁর আর কোন খোঁজই পাওয়া যায়নি। রাজা-বাহাদুর বহু চেষ্টা করেছেন, পুলিশ অনেক অনুসন্ধান করেছে, কিন্তু সব বৃথা। তাঁর কোন খবরই আর মেলেনি।

মণ্টু বলল, "আমাকে এই অবস্থায় রাখা কি উচিত হয়েছে?"

ডাক্তার ঘোষ বললেন, "থাক্, থাক্. এই অপ্রিয় ব্যাপারে আর অগ্রসর হয়ে দরকার নেই।"

কিন্তু ধরণীবাবু বাধা দিলেন, "মোটেই না—আমরা শেষ পর্য্যন্ত শুনতে চাই।"

রাজা-বাহাদুর চীৎকার করে বললেন, "সরোজিনী, বল তুমি কি বলতে চাও? তোমার কি হয়েছে?"

—"আমার কি হয়েছে! আমাকে খুন করে আমার শবদেহ দাহ না করে তোমরা মাটিতে পুঁতে রেখেছো, আমি প্রেত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাকে মুক্তি দাও। ওগো, এত নিষ্ঠুর তোমরা হয়ো না।"

—"তুমি কোথায়?" রাজা-বাহাদুর কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

—"এই বাড়ীতেই আছি। এই বাড়ীর মাটির তলেই আমার কঙ্কাল খুঁজে পাবে।"

—"এই বাড়ীর কোথায়?"

প্রশ্নের সঙ্গে-সঙ্গে মণ্টুর মুখে প্রবলতর যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল, এবং একটু পরেই তার সারাদেহ একটা অস্থির আবেগে আলোড়িত হতে লাগল।

ডাক্তার ঘোষ এবং শশাঙ্ক সামনে ছুটে গেলেন, কিন্তু তাঁরা হাত বাড়াবার আগেই মণ্টু মুখ থুবড়ে মেজের উপর পড়ে গেল।

চার

ডাক্তার ঘোষ যে পরীক্ষাটি দেখালেন, তার মধ্যে কি একটুও সত্যি নেই? না, সবটাই একটা বিরাট ফাঁকি? ডাক্তার ঘোষ কি মণ্টুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এই রকম একটা নাটকীয় ব্যাপারের অবতারণা করলেন? কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে?

মণ্টু তার অচেতন অবস্থায় বলেছে, তাতে তো পরিষ্কার মনে হয় রাজা-বাহাদুরই কুণালের মাকে হত্যা করেছেন; কিন্তু ডাক্তার

ঘোষের যদি রাজা-বাহাদুরকে ভৌতিক ক্ষমতার ভেল্কি দেখিয়ে টাকা আদায় করবার মতলব থাকত, তবে এমন একটা ব্যাপারের অবতারণা করা কখনই সঙ্গত নয়। ডাক্তার ঘোষ তাঁর মিডিয়ামের সাহায্যে রাজা-বাহাদুরকে হত্যাপরাধী বলে ইঙ্গিত করবেন, আর তিনি খুসী হয়ে ডাক্তার ঘোষকে দু'লাখ টাকা দিয়ে দেবেন—সে কখনও সম্ভব নয়।

আমার মাথার মধ্যে নানারকম অদ্ভুত চিন্তা ভীড় করে আসতে লাগল। সত্যই কি মণ্টুর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়েছিল? সত্যই কি লালগড়ের রাণীর কঙ্কাল এই প্রাসাদেরই কোথাও প্রোথিত আছে?

মণ্টুকে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে দেখে একটা গোলমালের সৃষ্টি হলো। পিসীমা "জল, জল", বলে ডাকাডাকি করতে লাগলেন। শশাঙ্ক সবাইকে সরিয়ে দিয়ে নিজের কাপড়ের খুঁট দিয়েই তাকে হাওয়া করতে লাগল। সে রামচরণকে ডেকে বলল, "যা, চট্ করে এক বালতি জল নিয়ে আয়।"

কয়েক মিনিট শুশ্রূষার পরেই মণ্টু আস্তে-আস্তে উঠে বসল। প্রথমে খানিকক্ষণ নির্ব্বোধের মত চারিদিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখল। তারপর ক্ষীণ হেসে বলল, "আমার কি হয়েছিল?"

কুণাল চাপা গলায় বলল, "যেতে দাও ওসব কথা! যা হবার তা হয়েই গেছে।"

শশাঙ্ক মণ্টুর পিঠে হাত বুলাতে-বুলাতে প্রশ্ন করল, "তোমার কি কিচ্ছু মনে পড়ে না মণ্টু?"

মণ্টু বলল, "আমার খালি এইটুকুই মনে পড়ে যে শেষের দিকটায় আমার সমস্ত শরীর যেন কেমন একটা ক্লান্তিতে জড়িয়ে আসছিল! খুব ঘুম পেলে যেমন হয়, অনেকটা সেই রকম।"

—"কোন ভৌতিক শব্দ তুমি শুনতে পেয়েছিলে?"

—"সেকি?"

—"যে-সব কথা তুমি বলেছিলে!"

মণ্টু অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলল, "আমি বলেছিলাম? না, শশাঙ্ক-বাবু, আমার কিচ্ছু মনে নেই।"

ধরণীবাবু মণ্টুকে সব খুলে বললেন। ডাক্তার ঘোষ বারবার দুঃখ প্রকাশ করে অনেকটা আপন মনেই বলতে লাগলেন, "ভারী অন্যায়, ভারী অন্যায়! আমার এরকম পরীক্ষা করাই উচিত হয়নি।"

তিনি রাজা-বাহাদুরের দিকে তাকালেন। বোধ হয় তিনি ভাবছিলেন, আর কি রাজা-বাহাদুর তাঁকে টাকা দেবেন?

ডাক্তার ঘোষ আবার বলতে লাগলেন, "আমি গোড়াতেই বলেছিলুম এই বাড়ীতে অমঙ্গলের ছায়া পড়েছে। এইসব ভৌতিক পরীক্ষা করাই অন্যায়। অধিকাংশ আত্মাই মিথ্যাবাদী—এইসব প্রেতাত্মাদের কথা মোটেই বিশ্বাস করা উচিত নয়—যত সব—"

শশাঙ্ক এই সময় ডাক্তার ঘোষকে বাধা দিয়ে বলল, "ডাক্তার ঘোষ, এ সময় এইসব আলোচনা আপনি যত কম করবেন, ততই ভাল।"

ডাক্তার ঘোষ আর কোন কথা বললেন না, লজ্জিত মুখে চুপ করে রইলেন।

রাজা-বাহাদুর অল্পকালের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "এ নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে দরকার নেই। তোমরা সবাই এবারে শুতে যাও। রাত অনেক হয়েছে।"

boiRboi.net

একে-একে সবাই লাইব্রেরী-ঘর থেকে বিদায় নিল। শশাঙ্ক এবং আমি যখন আমাদের ঘরে চলে এলুম, রাত তখন এগারোটা।

ঘরে এসে শশাঙ্ক তার পাইপ ধরালো।

—"তারপর?" শশাঙ্ক ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বলল।

—"আজকের পরীক্ষা সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়?" আমি প্রশ্ন করলুম।

—"সত্যি কথা বলতে কি, আমি যতই এই ভৌতিক ব্যাপার দেখছি, ততই আমার ডাক্তার ঘোষের সম্বন্ধে সন্দেহ হচ্ছে।"

—"কিন্তু মন্টু যা বললে তাতে তো মনে হয়, যেন রাজা-বাহাদুরই রাণীকে হত্যা করেছেন—"

—"ও তাই বলেছে বটে, কিন্তু তাহলেই কি তাই সত্যি বলে ধরে নিতে হবে?"

আমি প্রতিবাদ না করে পারলুম না, বললুম, "তুমি পরীক্ষাটাকে কি করে ফাঁকি বলতে পারো? দেখেছো তো মন্টুর চোখের তারা কত বড় হয়ে গিয়েছিল!"

শশাঙ্ক হাসল, "তা বটে! তবে দু' এক ফোঁটা বেলেডোনা চোখে দিলেও চোখের তারা এই রকম বড় হয়ে যায়।"

—"কিন্তু সে-ক্ষেত্রে তুমি ধরেই নিচ্ছ যে মন্টুর সঙ্গে যোগসাজসেই ডাক্তার ঘোষ এই নাটকের অভিনয় করেছেন, তাই নয়? তাছাড়া, ডাক্তার বেলেডোনা দেবার সময়ই বা পেলেন কখন? আমরা তো সব সময়ই তাঁর উপর দৃষ্টি রেখেছিলুম।"

শশাঙ্ক খানিকক্ষণ চুপ করে পাইপের কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে-ধীরে বলল, "কেন অসম্ভব কিসে? তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছিলে যে, ছোট টুলটায় বসবার আগে মন্টু একবার রুমাল দিয়ে মুখ মুছেছিল! রুমালটা যদি আগে থেকেই বেলেডোনায় ভিজানো থেকে থাকে, তবে তা থেকে দু'একটা ফোঁটা চোখের মধ্যে নিংড়ে দেওয়া কি একেবারে অসম্ভব?"

আমি অনেকটা হতাশ হয়েই বললুম, "তাই যদি হয়, তবে মন্টু যে একজন অত্যন্ত পাকা অভিনেতা, তাতে আর সন্দেহ নেই।"

শশাঙ্ক অত্যন্ত নিস্পৃহভাবে বলল, "অভিনয় তো সে করতই—অনেক কাল সখের থিয়েটারে ছিল।"

হঠাৎ দরজায় ঘা পড়ল? শশাঙ্ক পাইপটা নাবিয়ে রেখে বললে, "কে? আসুন, দরজা খোলাই আছে।"

ঘরে ঢুকলেন রাজা-বাহাদুর। তাঁর মুখ বিবর্ণ, চুলগুলি অবিন্যস্ত। ক্লান্তভাবে একটা চেয়ারে বসে তিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমার মনে হলো, তিনি বোধহয় শশাঙ্কের সঙ্গে গোপনে কোন কথা বলতে চান। তাই যাবার জন্য উঠে বললাম, "আমি বরং ততক্ষণ বাইরের ঘরে গিয়ে বসি।"

শশাঙ্ক আমার হাত ধরে ফের বসিয়ে দিয়ে বলল, "তোমার যাবার দরকার নেই।" তারপর রাজা-বাহাদুরের দিকে ফিরে বলল, "এর সামনে আপনি নিঃসঙ্কোচে আপনার কথা বলতে পারেন।"

রাজা-বাহাদুর আর বেশী ভূমিকা না করে সোজাসুজিই বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়েই তোমার কাছে এসেছি। মন্টু আবিষ্ট অবস্থায় যে-কথা বললে, তাতে স্পষ্টতঃই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হচ্ছে। এ সম্বন্ধে তোমার মত কি? আমি যে কি করব, তা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

শশাঙ্ক সহানুভূতির স্বরে বলল, "আপনি অত বিচলিত হচ্ছেন কেন? প্রথমতঃ মন্টু যা বলেছে, তাতে অভিযোগটা যে ঠিক আপনারই বিরুদ্ধে আমার তা মনে হয় না। আর দ্বিতীয়তঃ ডাক্তার ঘোষ নিজেই তো বললেন যে দুষ্ট প্রেতাত্মারা অধিকাংশ সময়েই মিথ্যাকথা বলে!"

—"কিন্তু শশাঙ্ক, কুণাল এখন আমাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। সে নিশ্চিত ধরে নিয়েছে যে আমিই তার মাকে হত্যা করেছি। শশাঙ্ক, তোমাকে আমি ধর্ম্মতঃ বলছি, আমি একেবারে নির্দ্দোষ! কিন্তু কুণাল তো তা বিশ্বাস করবে না!" বলতে-বলতে রাজা-বাহাদুর অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলেন। তাঁর মুখে প্রবল যন্ত্রণার চিহ্ন দেখা দিল।

তারপর একটু সামলে নিয়ে বললেন, "কুণাল তার মাকে অসম্ভব রকম ভালবাসত। ওর যখন একবার বিশ্বাস হয়েছে যে আমিই ওর মার হত্যাকারী, তখন ও কিছুতেই আমাকে ক্ষমা করবে না।"

এরপর কিছুক্ষণ কেউই কোন কথা বলল না। শেষে শশাঙ্কই নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, "কুণালের মা কি অবস্থায় বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন?"

—"মণির সঙ্গে রাগারাগি করে বাপের বাড়ী যাব বলে চলে যায়!"

—"এই বাড়ী থেকেই?"

—"হ্যাঁ—এখান থেকেই।"

—"আপনি তখন কোথায় ছিলেন?"

—"আমি তখন একটা বৈষয়িক কাজে কলকাতা গিয়েছিলুম।"

—"তারপর ফিরে এসে দেখলেন যে কুণালের মা চলে গেছেন?"

boiRboi.net

ডাক্তার শালগোছে মৃতদেহের মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে···

—"হ্যাঁ। তিনি ওই মর্ম্মে আমার কাছে একখানা চিঠিও লিখে রেখে গিয়েছিলেন।"

—"চিঠিটা কি আছে?"

—"না, আমি রাগ করে পুড়িয়ে ফেলেছি। আমাদের বংশের নিয়ম—বিবাহের পর কোন বউই আর এ-বাড়ী ছেড়ে যেতে পারবে না, কিন্তু সে যখন এতবড় একটা বংশের সম্মানের কথা মোটেই ভাবলে না, আর আমার কলকাতা থেকে ফিরে আসা পর্য্যন্তও অপেক্ষা করলে না, তখন আমারও খুব রাগ হলো"—রাজা-বাহাদুর হঠাৎ থেমে গেলেন।

শশাঙ্ক বলল, "আমি আরও দু-একটা প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনি কবে কলকাতা গিয়েছিলেন, সে তারিখটা কি আপনার মনে আছে?"

—"আছে। সে তারিখটা চিরকাল আমার মনে থাকবে। আমি কলকাতা গিয়েছিলাম ১৯৩৪ সালের ২২শে ডিসেম্বর। সে দিনটা ছিল নবমী। সবাই আমাকে যেতে নিষেধ করেছিল, কিন্তু আমি শুনিনি।"

—"আপনি কলকাতায় কোথায় উঠেছিলেন?"

—"গ্র্যাণ্ড হোটেলে। আমি সাতাশ তারিখে লালগড়ে ফিরে আসি; কিন্তু তার মধ্যে কুণালের মা চলে গেছেন।"

—"কুণালের মা যাবার আগে আর কাউকে কিছু বলে গেছেন বলে আপনি শুনেছেন?"

—"না। শুধু মণির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল। তার ফলে মণিও রাগ করে তার শ্বশুর-বাড়ী চলে যায় আর কুণালের মাও বাপের বাড়ীর নাম করে চলে যান।"

boirboi.net

—"কে আগে যান ?"

—"আমার বোন মণি।"

—"তাঁরা কি রকম ভাবে চলে গিয়েছিলেন ? অর্থাৎ তাঁদের সঙ্গে কেউ গিয়েছিল কিনা ?"

—"প্রথমে মণি আমার গাড়ী করে চলে যায়। ঠিক সেই সময় একজন অচেনা ভদ্রলোক একখানা কালো রংএর গাড়ী নিয়ে আমাদের বাড়ীতে আসে। মণির ড্রাইভার তাকে দেখেছে। তার পরের দিন সকাল বেলায়ই সেই ভদ্রলোকটি ও কুণালের মাকে আর রাজ-বাড়ীতে দেখা যায়নি। কুণালের মা লিখে রেখে গেছেন যে, তিনি তাঁর দাদার সঙ্গে বাপের বাড়ী যাচ্ছেন। তাঁর দাদারও তো উচিত ছিল একবার আমার সঙ্গে দেখা করে তবে তাঁর বোনকে নিয়ে যাওয়া !"

—"ড্রাইভারটির নাম কি ?"

—"ললিত ; আজ সন্ধ্যায় তোমাদের জন্য গাড়ী নিয়ে যার যাবার কথা ছিল।"

—"সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটিকে কেউ ভাল করে দেখেছিল ?"

—"না। রামচরণ বলেছিল যে শীতকাল বলে তিনি মুখেরও প্রায় সবটাই শাল দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন।"

—"কুণালের মামাকে এ-বাড়ীর কেউ চিনত না ?"

—"না। কারণ তিনি খুব অল্প বয়সেই ব্যবসা উপলক্ষে বর্ম্মা চলে যান, আর ফেরেননি সেখান থেকে।"

—"আপনি কুণালের মাকে আনতে পাঠান নি ?"

—"প্রথমে রাগ করে ভেবেছিলুম যে, বংশের এতবড় নিয়মটা যে

রক্ষা করলে না, তাকে আনবার আর দরকার নেই। কিন্তু রাগ পড়ে গেলে তাকে আনতে লোক পাঠিয়েছিলুম। লোক ফিরে এসে বলল, সেখানে সে যায়নি।"

—"তারপরে আর আপনি কোন খোঁজ করেননি ?"

—"নিশ্চয়ই করেছিলুম। পুলিশ, প্রাইভেট্ ডিটেক্‌টিভ—কিছুই বাদ রাখিনি ; কিন্তু কোন ফল হয়নি। সে বেঁচে আছে কিনা তাইবা কে জানে ? তার সেই দাদারও কোন খোঁজ পাই নি।"

শশাঙ্ক শুধু বলল, "ভারী আশ্চর্য্য তো !"

তারপর একটু থেমে আবার বলল, "আচ্ছা, কুণালের মার সঙ্গে আপনার পরিবারস্থ আর সবার কি রকম সদ্ভাব ছিল ?"

রাজা-বাহাদুর একটুকাল ভেবে বললেন, "সবার সঙ্গেই অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। এক ধরণীই মাঝে-মাঝে এসে তাকে বিরক্ত করত।"

—"কি রকম ?" শশাঙ্ক প্রশ্ন করল।

—"প্রায়ই এসে টাকা চাইত ; এবং প্রত্যেকবারেই জোরজার করে দু'এক হাজার অন্ততঃ নিয়েও যেত। ধরণী আগে খুব বদ্‌রাগী ছিল ; আমি পর্য্যন্ত তার রাগকে ভয় করতুম। তাছাড়া, স্নেহের খাতিরে আমরা ওকে খানিকটা প্রশ্রয়ও দিতুম !"

শশাঙ্ক শুধু বলল, "হুঁ।"

রাজা-বাহাদুর কোলের উপর হাত দুখানা রেখে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। শেষে হঠাৎ একবার বলে উঠলেন, "না শশাঙ্ক, এ হতেই পারে না। কুণাল আমাকে সন্দেহ করবে, আমাকে তার মাতৃহন্তা মনে করে ঘৃণা করবে, সে আমি সইতে পারবো না। আমি কালই মিস্ত্রী লাগিয়ে সমস্ত রাজবাড়ীর মেজে খুঁড়ে ফেলব। প্রথমেই গুদাম-ঘর

থেকে আরম্ভ করব। এ-বিষয়ে আমি তোমার সাহায্য চাই। বল, তুমি আমাকে সাহায্য করবে ?"

শশাঙ্ক শান্তভাবেই বলল, "বেশ, তাতে যদি আপনার মন সুস্থির হয়, আমি না-হয় তা'হলে এ-কাজের ভার নেব।"

রাজা-বাহাদুর উঠতে-উঠতে বললেন, "তাতে আর কিছু না হোক, কুণালের সন্দেহ তো যাবে। সেই আমার যথেষ্ট। কুণালের ঐ সন্দিগ্ধ দৃষ্টি আমি কিছুতেই সইতে পারছিনে। যাক্ অনেক রাত হলো, তোমরা এবারে শোও।"

এই বলে তিনি যাবার জন্য পা বাড়ালেন ; কিন্তু শশাঙ্ক বাধা দিয়ে বলল, "আর পাঁচ মিনিট বসুন, আমি আরও দু'একটা কথা জানতে চাই।"

রাজা-বাহাদুর আবার বসলেন।

শশাঙ্ক বলল, "ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে আপনার পরিচয় কতদিনের ?"

—"তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় খুব অল্পই। তবে তাঁর বই আমি অনেক পড়েছি। সত্য কথা বলতে কি, অনেকটা তাঁর বই পড়েই আমার মনটা প্রেততত্ত্বের আলোচনার দিকে ঝুঁকেছে।"

"তাঁর সম্বন্ধে আপনি আর কিছু জানেন না ?"

—"সামান্যই। প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর আগে তিনি কলকাতার একজন নামকরা ডাক্তার ছিলেন। সেই সময় তাঁর স্ত্রী হঠাৎ একটা মোটর-দুর্ঘটনায় মারা যান। এই ঘটনায় তিনি মনে অত্যন্ত আঘাত পান এবং সেই থেকেই তিনি প্র্যাক্‌টিশ ছেড়ে দিয়ে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন। আজকাল বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে তিনি

একজন শ্রেষ্ঠ প্রেততত্ত্ববিদ্। সেইজন্যই তো তাঁর ওই পরীক্ষায় আমি এতটা বিচলিত হয়েছি।"

—"কিন্তু তাঁর চলে কি করে ?"

—"তাঁর নিজের কিছু সম্পত্তি আছে। তাছাড়া, তিনি খুব আড়ম্বর জীবনই যাপন করেন। বই থেকে কিছু আয় হয়। এইসব দিয়ে চলে যায়।"

শশাঙ্ক শুধু বলল, "হুঁ !" একটু পরে আবার বলল, "আপনার সঙ্গে তাঁর আলাপ কতদিনের ?"

—"চিঠিপত্রে আলাপ অনেক দিনের, প্রায় বছর-দশেক হলো। কিন্তু চাক্ষুষ দেখা হয়েছে কলকাতায় মাত্র মাস দু'-এক আগে।

ডাক্তার ঘোষ সে সময়ে কলকাতায় এসেছিলেন, আমিও একটা কাজে তখন কলকাতা গিয়েছিলুম। আমি টেলিফোনে তাঁকে জানিয়েছিলাম যে, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব ; কিন্তু হঠাৎ অসুখ হয়ে পড়ায় নিজে সেদিন যেতে পারিনি, মণ্টুকে পাঠিয়েছিলাম তাঁর কাছে। তার চারদিন পরে আমি ভাল হয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই।"

শশাঙ্ক বলল, "আমার আর কিছু জানবার নেই। আপনি এখন শুতে যান। যদি সম্ভব হয়, রামচরণকে একবার পাঠিয়ে দেবেন।"

রাজা-বাহাদুর বেরিয়ে গেলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "ডাক্তার ঘোষকে কেমন মনে হচ্ছে তোমার ?"

সংক্ষেপে বলল, "অত্যন্ত গভীর জলের মাছ !"

boiRboi.net

তারপর কাগজ-কলম বের করে সে চিঠি লিখল এখানকার থানার ইন্-চার্জের কাছে। প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়ে লিখল—

১৯৩৪ সালের ২২শে থেকে ২৭শে অক্টোবরের মধ্যে স্থানীয় কোন সিমেন্ট-ব্যবসায়ী এই রাজবাড়ীতে সিমেন্ট বিক্রী করেছে কিনা, অনুগ্রহ করে সেই সন্ধানটুকু কাল সকালের মধ্যেই যদি আমাকে জানাতে পারেন তবে অত্যন্ত উপকৃত হব ; আশা করি, অনুসন্ধানের ফলটি অত্যন্ত গোপন রাখবেন। কাল এই পত্র-বাহককেই আবার আপনার কাছে পাঠাব।

রামচরণ ইতিমধ্যে নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। শশাঙ্ক পত্রখানা খামে ভর্তি করে তার হাতে দিয়ে বলল, "চিঠিখানা নিয়ে এক্ষুনি থানার দারোগাবাবুকে দিয়ে আসবে। কাল আবার বেলা দশটার সময় তাঁর কাছে যাবে। তিনি যদি কোন চিঠি দেন তবে নিয়ে এসে আমাকে দেবে।"

রামচরণ চিঠি নিয়ে চলে গেল।

পাঁচ

সে রাত্রে কেন যেন ভাল ঘুম হলো না! একটু তন্দ্রার মত আসে, আবার পরক্ষণেই ঘুম ভেঙ্গে যায়। কখনও দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠি। কিন্তু, শশাঙ্ক দেখি অকাতরে ঘুমুচ্ছে! হঠাৎ মনে হলো কে যেন বারান্দায় চলে বেড়াচ্ছে! আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

ঘণ্টাখানেক পরে মনে হলো, কোথায় যেন ভারি একটা জিনিষ পড়ল! আবার কিছুক্ষণ পরে কে যেন গট্‌গট করে বারান্দা দিয়ে

হেঁটে গেল! এই রকম তন্দ্রা-জাগরণের মধ্য দিয়ে ভোর পাঁচটা বাজল। আর ঘুমের কোন আশা নেই দেখে উঠব কিনা ভাবচি, এমন সময় বাইরে মণি-পিসীমার আওয়াজ পাওয়া গেল।

আমি দরজা খুলে বাইরে বেরুলাম। দেখি, পিসীমা আমাদের ঘরের দিকে ছুটে আসছেন। আমাকে দেখে কেমন একটু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন!

তখন ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। আমি সেই আবছা-আলোতেও দেখলুম, পিসীমা অত্যন্ত ভয় পেয়েছেন। তাঁর হাত-পা একটা প্রবল আবেগে কাঁপছে।

আমি সামনে এগিয়ে গিয়ে বললুম, "কি হয়েচে পিসীমা?"

ভয়ে বা উত্তেজনায় তিনি ভাল কথা বলতে পারছিলেন না, কোন-মতে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, "এদিকে দেখে যাও।"

তাঁর পিছনে পিছনে ধরণীবাবুর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম। দরজা খোলা। পিসীমা আঙ্গুল দিয়ে ঘরের মধ্যে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "ওই ছাখো।"

ঘরের মধ্যে বড় একখানা খাট। তার উপরে ধরণীবাবু শুয়ে আছেন আর তাঁকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে মণ্টু।

এর মধ্যে যে কিছু অস্বাভাবিক থাকতে পারে, তা আমার মনে হলো না। তাই আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পিসীমার দিকে তাকালুম।

তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "বুঝতে পারছো না?"

আমি তখনও কিছু বুঝতে পারলুম না। যা হোক্, এগিয়ে গেলুম খাটের দিকে।

মন্টুর পা-দুটো খাট থেকে অনেকখানি বেরিয়ে আছে। ভাবলুম ওর পা-দুটো বিছানার উপর তুলে দিই। কিন্তু এ কি? ওর পা দুটো যে অসম্ভব রকম ভারী মনে হচ্ছে! গা-ই বা এত ঠাণ্ডা কেন? গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম।

হঠাৎ আমার সমস্ত দেহ যেন শির্-শির্ করে উঠল! কি সর্ব্বনাশ! মন্টু মারা গেছে!

সেই ঠাণ্ডাতেও আমার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে উঠল। এ কি ব্যাপার? কাল রাতেও ওকে সুস্থ-সবল দেখেছি, আর এর মধ্যে মন্টু মরে গেল? শুধু তাই নয়, ওর দেহ যে রকম আড়ষ্ট হয়ে গেছে, তাতে মনে হয়, অনেকক্ষণ হলো ওর মৃত্যু হয়েচে।

পাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, শশাঙ্ক এসে দাঁড়িয়েছে।

শশাঙ্ক আমাকে বলল, "নিখিল, তুমি ডাক্তার ঘোষকে ডেকে নিয়ে এসো।" তারপর পিসীমার দিকে ফিরে বলল, "পিসীমা, আপনি এক্ষুণি রাজা-বাহাদুরকে সংবাদ দিন। সমরকেও বলবেন এখানে আসতে।"

আমি যখন ডাক্তার ঘোষকে নিয়ে ধরণীবাবুর ঘরে এলুম, তখন দেখি, শশাঙ্ক ধরণীবাবুকে তুলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কি কুম্ভকর্ণের মত তাঁর ঘুম, কিছুতেই ভাঙ্গতে চায় না!

অনেক ধাক্কাধাক্কির পর তিনি চোখ মেললেন; কিন্তু চোখ মেলেই সবাইকে এই রকম ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, তার ঘুমের ঘোর উড়ে গেল! তিনি দেখলেন, মন্টু তাঁকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে।

মন্টুকে তিনি সরিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মৃতদেহ এত আড়ষ্ট হয়ে গেছে যে তিনি একটু নাড়াতেও পারলেন না!

তিনি বোধহয় বুঝতেই পারেননি যে মন্টু মারা গেছে। তিনি চীৎকার করে বললেন, "মন্টু হাত ছাড়্, উঠতে দে। আর তুই যে বড় আমার বিছানায় শুতে এসেছিস?"

শশাঙ্ক অল্প কথায় ধরণীবাবুকে সব ব্যাপার বুঝিয়ে দিলে। শুনে ধরণীবাবু প্রথমে খানিকক্ষণ অভিভূতের মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন, যেন কোন কথাই তাঁর কানে যায়নি। তারপর অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম হবার সাথে-সাথেই তিনি জোর একটা ঝটকা মেরে মন্টুর হাতটা সরিয়ে দিলেন।

এমন সময় দরজায় একজন অপরিচিত লোক এসে দাঁড়ালেন। পরে জেনেছিলুম, তিনি ধরণীবাবুর ছোট ভাই রজনীবাবু। তিনিও ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কি? এ ঘরে এত ভীড় কেন?"

কিন্তু কেউ তাঁর প্রশ্নের জবাব দিল না।

শশাঙ্ক ডাক্তার ঘোষকে ডেকে বলল, "আপনি ওর মুখের গন্ধ শুঁকে দেখুন। আমার মনে হচ্ছে ঈষৎ ঝাঁঝাল একটা মিষ্টি গন্ধ আসচে। আপনি তো একজন নাম-করা ডাক্তার ছিলেন। গন্ধটা কিসের, বলুন।"

ডাক্তার আলগোছে মৃতদেহের মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে তার ঠোঁটের গন্ধ শুঁকে দেখলেন। তারপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "আশ্চর্য্য, শশাঙ্কবাবু! আমার মনে হচ্ছে ইথারের গন্ধ আসচে!"

ডাক্তারের মত শুনে শশাঙ্কের মুখের ভাব কঠিন হয়ে এলো। সে অত্যন্ত নীরস কণ্ঠে বলল, "না ডাক্তার ঘোষ, এটা মোটেই ইথারের গন্ধ নয়!"

ডাক্তার আমতা-আমতা করে বললেন, "আমি অনেককাল প্র্যাক্‌টিশ ছেড়ে দিয়েছি। সব ভুলে গেছি শশাঙ্কবাবু।"

—"কিন্তু একজন সাধারণ লোকও বলতে পারত যে এ গন্ধটা ক্লোরোফর্মের।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও ঠিক ক্লোরোফর্মের কথাই ভাবছিলুম।" ডাক্তার ঘোষ দ্বিধাগ্রস্তভাবে বললেন।

ক্ষণিকের জন্য শশাঙ্কের ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল; সে বলল, "আচ্ছা ডাক্তার ঘোষ, ক্লোরোফর্ম্ কিসে-কিসে ব্যবহার হয় বলতে পারেন?"

—"কেন! অজ্ঞান করে ফেলতে।"

—"আর কিসে?"

—"আর কিসে আবার?"

—"ডাক্তার ঘোষ, মেডিকেল কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের একজন ছাত্রও বলতে পারে ক্লোরোফর্ম্ কি-কি কাজে ব্যবহার হয়।"

শশাঙ্কের কথায় ডাক্তার অপমানিত বোধ করলেন, বিরক্তির সঙ্গে বললেন, "আমি এখানে পরীক্ষা দিতে আসিনি শশাঙ্কবাবু!"

শশাঙ্ক সে কথা গায়ে না মেখে বলল, "শরীরের কোন জায়গা অবশ করে ফেলতে হলেও ক্লোরোফর্মের দরকার হয়। দাঁতের যন্ত্রণায় অনেকেই ক্লোরোফর্ম্ ব্যবহার করে থাকেন, ডাক্তার ঘোষ!"

একটু থেমে সে আবার বলল, "মৃতদেহ ত' আড়ষ্ট হয়ে গেছে দেখছি! আপনি বলুন তো কতক্ষণ ও মারা গেছে?"

ডাক্তারের কণ্ঠে আবার দ্বিধার ভাব দেখা দিল। তিনি বললেন, "অনেককাল ধরে শুধু প্রেততত্ত্ব নিয়েই আছি। ডাক্তারীর সবই

ভুলে গেছি। মাপ করবেন, আমাকে দিয়ে আপনার কোন কাজ হবে না শশাঙ্কবাবু!"

ডাক্তার ঘোষ চলে গেলেন।

শশাঙ্ক সমরকে বলল, "একটা থার্মোমিটার নিয়ে এসো।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই সমর থার্মোমিটার নিয়ে এলো। শশাঙ্ক মৃত-দেহের মুখের মধ্যে থার্মোমিটার পুরে দিয়ে বলল, "মৃতদেহ যে রকম শক্ত হয়ে গেছে, তাতে মনে হয় চার-পাঁচ ঘণ্টা হলো ওর মৃত্যু হয়েচে। মৃতদেহ প্রথমে আড়ষ্ট হতে সুরু করে মাথার দিক থেকে। ওর তো পা পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছেচে। দেখি থার্মোমিটার কি বলে।"

শশাঙ্ক থার্মোমিটার পরীক্ষা করে বলল, "টেম্পারেচার এইট্টিনাইন পয়েণ্ট ফোর, অর্থাৎ স্বাভাবিকের চাইতে প্রায় সাড়ে আট ডিগ্রি কম। সাধারণতঃ মৃত্যুর পরে প্রতি ঘণ্টায় টেম্পারেচার প্রায় দু' ডিগ্রি করে কমতে থাকে।"

একটু থেমে আবার বলল, "এখন সকাল সাড়ে পাঁচটা; আমার মনে হয় রাত সাড়ে বারোটা থেকে একটার মধ্যে মণ্টুর মৃত্যু হয়েচে।"

আমি হঠাৎ বলে উঠলুম, "আমি কাল সারারাতই প্রায় জেগে কাটিয়েছি। রাত্রে নানা রকম অদ্ভুত আওয়াজ আমার কানে এসেচে।—"

শশাঙ্ক আমাকে বাধা দিয়ে বলল, "সে সব এখন বলতে হবে না। তুমি থামো এখন।"

ঘরের মধ্যে একটি মাত্র জানলাই শুধু বাইরের দিকে। শশাঙ্ক জানলাটার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে কার্ণিশটা দেখল;

শেষে অনেকটা আত্মগত ভাবেই বলল, "এই জানলার নীচেই গ্যারেজ। কিন্তু কার্ণিশের উপর কোন রকম দাগ নেই দেখচি!"

তারপর হঠাৎ ধরণীবাবুর দিকে ফিরে বলল, "আপনি এর কিছু জানেন না?" তার কণ্ঠে সন্দেহের সুর।

ধরণীবাবু যেন এই ঘটনায় একেবারে মুষড়ে গেছেন! অত্যন্ত ধীরে-ধীরে প্রায় ফিস্-ফিস্ করে তিনি বললেন, "বিশ্বাস করুন শশাঙ্কবাবু, আমি একেবারেই কিছু জানিনে। আমার কথা কি আপনার একেবারেই বিশ্বাস হয় না যে—" তিনি মাঝখানে থেমে গেলেন।

—"আপনার কথা একেবারে অসম্ভব হয়ত নয়। কারণ যাদের ঘুম খুব গাঢ়, তারা অল্পেতে কিছুই টের পায় না।"

শশাঙ্কের কথায় ধরণীবাবু যেন অনেকটা স্বস্তি বোধ করলেন! একটু উৎসাহের সঙ্গেই বললেন, আমি ঘুমুই ঠিক মড়ার মত। আপনারাই তো কত ধাক্কাধাক্কি করে আমাকে তুলেছেন!"

এমন সময় কুণাল এসে দরজায় দাঁড়াল, তার পিছনে রামচরণ।

শশাঙ্ক রামচরণকে বলল, "তুমি এক্ষুনি থানায় যাও। গিয়ে রাজা-বাহাদুরের নাম করে দারোগাবাবুকে কয়েকজন পুলিশ নিয়ে এক্ষুনি এখানে চলে আসতে বলবে।"

কুণাল বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, "পুলিশ! পুলিশ কেন?"

শশাঙ্ক সংক্ষেপে উত্তর দিল, মণ্টু খুন হয়েচে।"

ওর কথা শুনে কুণাল নির্ব্বাক হয়ে গেল।

শুধু কুণাল নয়, খুন হয়েচে কথাটা যেন সবাইকেই বজ্রাঘাতের মত আহত করল! কুণাল জড়িত কণ্ঠে বলল, "খুন? মণ্টুকে?—

সেকি! মণ্টুকে কে খুন করবে, আর কেনই বা করবে?—না-না, সে কখনও হতে পারে না—সেকি? মণ্টু?—না-না—"

কুণাল কি বলচে তা বোধহয় ও নিজেই জানে না!

রাজা-বাহাদুর এতক্ষণ একটাও কথা বলেননি; কিন্তু এবারে তিনিও প্রতিবাদ করলেন, 'তুমি বলচ মণ্টু খুন হয়েচে! কিন্তু এখানে কে তাকে খুন করবে বল?"

একটু থেমে আবার বললেন, "মণ্টু যদি কিছু খেয়েই মারা গিয়ে থাকে, তবে সেতো আত্মহত্যাও হতে পারে!"

শশাঙ্ক তখনই এ-কথার কোন জবাব দিল না, শুধু রামচরণকে বলল "রামচরণ, যাও তুমি আর বেশী দেরী করো না, থানায় চলে যাও।"

তারপর রাজা-বাহাদুরকে বলল, "আত্মহত্যা যে হতেই পারে না এমন নয়। ক্লোরোফর্মে ওর মৃত্যু হয়েছে। যদি আত্মহত্যাই হয়, তবে ক্লোরোফর্মের শিশি নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও পাওয়া যাবে; কিন্তু হাতের কাছে তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না—ভাল করে এবার খুঁজে দেখা যাক্ বরং।"

পুলিশ না-আসা পর্য্যন্ত শশাঙ্কই যে কোন রকম অনুসন্ধান করবার যোগ্যমত লোক, সে বিষয়ে কারুরই সন্দেহ ছিল না। রাজা-বাহাদুরও সেই মতই প্রকাশ করলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি বারবার বলতে লাগলেন যে, এটা আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না—খুন অসম্ভব।

ধরণীবাবুর ঘরে আসবাব-পত্র বিশেষ কিছুই ছিল না। অল্পকালের মধ্যেই আমরা ঘরখানা ভাল করে খুঁজে দেখলুম। কোথাও ক্লোরোফরমের শিশির পাত্তা পাওয়া গেল না।

শশাঙ্ক আমাকে বলল, "এখানে তো কিছুই পাওয়া গেল না। চল, মণ্টুর ঘরটা খুঁজে দেখা যাক্।"

যাবার সময় আর সবাইকে বলে গেল, "আমরা যতক্ষণ মণ্টুর ঘর থেকে ফিরে না আসি, ততক্ষণ আপনারা লাইব্রেরী-ঘরে গিয়ে বসুন।"

ছয়

মণ্টুর ঘরটি ছোট, কিন্তু বেশ সাজানো-গোছানো। মাঝখানে ইংলিশ-প্যাটার্নের নীচু একখানা খাট। এককোণে ড্রয়ারআলা ডেস্ক, তার উপরে একটা ফিলিপস্‌এর রেডিও। গোটা-দুই চেয়ার, বড় একটা চামড়ার সুটকেশ—এইসব।

বিছানা দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল, রাত্রে সেখানে কেউ শুয়েছিল। খাটের তলায় মণ্টুর হরিণের চামড়ার চটিজোড়াও সাজানো রয়েছে।

শশাঙ্ক বলল, "দরজাটা বন্ধ করে দাও নিখিল!"

আমি দরজা বন্ধ করলে শশাঙ্ক তার অনুসন্ধান আরম্ভ করল। একটা ড্রয়ারের মধ্যে ছোট একশিশি বেলেডোনা পাওয়া গেল। শশাঙ্ক শিশিটি আমার চোখের সামনে ধরে শুধু নিঃশব্দে হাসল। কিন্তু ক্লোরোফর্মের শিশি কোথাও পাওয়া গেল না। আমি একটু দ্বিধা করেই বললুম, "ক্লোরোফর্ম যদি এই ঘরেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই গন্ধ পাওয়া যেত—"

শশাঙ্ক আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "যদি না বাতাসের ঝাপটা দিয়ে সব গন্ধ দূর করা হত!"

—"মানে?" আমি বুঝতে না পেরে বললুম।

—"মানে আবার কি! ঘরের সব জানলাগুলো বন্ধ অথচ ঘরের মেঝেতে জল, সেটা লক্ষ্য করেছো? কাল সারারাত ধরে বৃষ্টি হয়েচে, এবং ঐ জানলাটা অনেকক্ষণ খোলা ছিল। তার পরে আবার অবশ্য জানলা বন্ধ করা হয়েছে। তা নইলে মেজেতে জল আসবে কেমন করে? এখন কথা হচ্ছে, জানলাটা খানিকক্ষণ খুলে রেখে বন্ধ করার উদ্দেশ্য কি? সে আর কিছুই নয়, শুধু হাওয়ার সাহায্যে গন্ধটা উড়িয়ে দেওয়া।"

আমি বললুম, "আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে, কাল রাতে গেটে যে লোকটা ছিল, সেই হয়ত বাইরে থেকে মই লাগিয়ে এই জানলা খুলে—"

—"তা যদি হয় তবে জানলার নীচে মাটিতে পায়ের দাগ, এবং কার্ণিশের উপরে কাদার দাগ, বা মই লাগানোর দাগ কিছু-না-কিছু থাকবেই। বেশ দেখা যাক্, তাই আছে কিনা!"

শশাঙ্ক ভাল করে জানলার বাইরেটা পরীক্ষা করল; কিন্তু কোথাও এমন কোন চিহ্ন নেই যাতে বোঝা যায় বাইরে থেকে কোন লোক ভিতরে এসেছিল।

আর কিছু দেখবার না থাকায় আমরা লাইব্রেরীতে চলে এলুম।

রাজা-বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন, "শশাঙ্ক, এখনও কি তোমার ধারণা যে মণ্টুকে কেউ হত্যা করেছে?"

—"নিশ্চয়ই।" শশাঙ্ক দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল।

—"কিন্তু তুমি যা বলছো তার অর্থ কি দাঁড়ায় ভেবে দেখেছো? তোমার কথার একটিমাত্র অর্থ হতে পারে এবং তাহলো এই যে, আমাদেরই কেউ মণ্টুকে হত্যা করেছে!"

শশাঙ্ক অত্যন্ত শান্তভাবে জবাব দিল, "হাঁ, তাই আমার মত।"

এরপর শশাঙ্ক একান্তে আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কাল রাতে কি শব্দ শুনতে পেয়েছিলে?"

আমি যা-যা শুনেছিলুম সব বললুম।

আমি শেষে বললুম, "আমি বিছানা থেকে উঠে মণি-পিসীমাকে শুধু দেখেছিলাম ধরণীবাবুর ঘরের সামনে। তিনিই কি—"

শশাঙ্কর মুখে হাসি দেখা দিল; বলল, "বটে! তবে তুমি যে নানারকম আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলে, তাতেই বোঝা যায়, পিসীমা ছাড়া আরও কেউ কেউ রাত্রে তাঁদের ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন।"

—"কে কে বেরিয়েছিলেন, তুমি মনে কর?"

—"একজন হলো আমাদের সমর, পিসীমার ছেলে। সে রাত্রে একবার ধরণীবাবুর ঘরে গিয়েছিল। ডাক্তার ঘোষও বেরিয়েছিলেন, তবে তিনি বাড়ীর বাইরে পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তিনিও হয়ত একবার ধরণীবাবুর ঘরে ঢুকেছিলেন!"

—"তুমি বুঝলে কি করে?"

—"তুমি লক্ষ্য করেছো কিনা জানিনে, সমরই একমাত্র এই বাড়ীতে সিগারেট খায়। আর সেও যে-সে সিগারেট নয়, একেবারে ব্ল্যাক্ এণ্ড হোয়াইট। আমি ওরই একটা সিগারেটের টুকরো ধরণীবাবুর ঘরে আজ পেয়েছি—সদ্য-খাওয়া, তাতে মনে হয় কাল রাতে সেটি ওখানে পড়েছে। আমি সেটি পকেটে করে নিয়ে এসেছি।"

শশাঙ্কের সূক্ষ্মদৃষ্টি দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেলুম; বললুম, "আর ডাক্তার ঘোষ?"

—"তুমি তাঁর ঘরে গিয়েছিলে তাঁকে ডাকতে অথচ তোমার

নজরে পড়েনি; কিন্তু আমি তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে আজ ভোরবেলা হেঁটে যাবার সময় লক্ষ্য করেছি যে, তাঁর ঘরে একটি ছাতা রয়েছে একটা চেয়ারে ঠেস দেওয়া, এবং সেটি সপ্‌সপে ভিজে। তা থেকে কি এটুকুও বোঝা যায় না যে, তিনি রাতে বাড়ীর বাইরে গিয়েছিলেন?—নিখিল, এদের যে কেউ অপরাধী হতে পারে।···চল, বাথরুমটা একবার দেখে আসি।"

—"বাথরুমে কেন?"

—"এখানে হত্যার একটা সূত্র হলো ক্লোরোফর্মের শিশি। এই প্রমাণটি নষ্ট করবার জন্য হত্যাকারী কি করতে পারে বল দেখি?"

—"তুমিই বল, আমি তো ভেবে পাইনে, তার সঙ্গে বাথরুমে কি যোগ থাকতে পারে?"

—"আচ্ছা, কেমন ভাবে খুনটা হয়েছে একবার কল্পনা করা যাক্।

মণ্টু ঘুমিয়ে আছে তার বিছানায়। এমন সময় হত্যাকারী দরজা দিয়েই ঘরে ঢুকল; কারণ, দরজা খোলাই থাকে। সে এসে শিশি থেকে রুমালে ক্লোরোফর্ম ঢেলে মণ্টুর নাকের কাছে চেপে ধরল। যাতে মণ্টু কোন চীৎকার না করতে পারে, সেজন্য তার মুখও বোধহয় চেপে রেখেছিল। এইরকম ভাবে মণ্টুর মৃত্যু হলো।

এখন হত্যাকারী কিসের দিকে নজর দেবে? যাতে হত্যার কোন প্রমাণ না থাকে এই তো? যাতে মনে হয় এটা হত্যা নয়, আত্মহত্যা, ঘুমের ঘোরে আপনিই হার্টফেল করে মরেছে। বেশ! তখন সে চেষ্টা করবে প্রমাণ লোপ করতে। কিন্তু কেমন করে? রুমালখানা সে পুড়িয়ে ফেলবে এবং তার ছাইগুলো ওয়াশ্-বেসিনের মধ্যে ধুয়ে ফেলবে, যাতে আর কোন চিহ্ন না থাকে।"

—"কিন্তু ক্লোরোফরমের শিশি ?"

—"ঠিক বলেছো। একটা শিশি তো আর ওয়াশ-বেসিনের পাইপের মধ্য দিয়ে গলে যেতে পারে না! তাই শিশিটাকে ভেঙ্গে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে ফেলতে হবে। আবার এও দেখতে হবে যেন শব্দ না হয়। কেমন, তাই না? তার পক্ষে সহজ উপায় হলো শিশিটা একটা তোয়ালের মধ্যে জড়িয়ে পায়ের চাপ দিয়ে গুঁড়ো করে ফেলা। তারপর সেই গুঁড়োগুলো ওয়াশ-বেসিনে ধুয়ে ফেললেই হলো।"

শশাঙ্কের যুক্তি দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। বাথরুমে একখানাই মাত্র তোয়ালে ছিল। শশাঙ্ক সেখানা ভাল করে পরীক্ষা করে আমাকে দেখাল, বলল, "এই দেখ, আমি যা বলেছি তাই ঠিক!"

সত্যই তোয়ালের মধ্যে তখনও পর্য্যন্ত খুব ছোট-ছোট কয়েকটা কাঁচের টুকরো আটকে ছিল।

আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না, বললুম, "এতসব তোমার মাথায় এলো কি করে শশাঙ্ক?"

—"তোমাকে তো অনেকবার বলেছি, কোন অপরাধের কিনারা করতে হ'লে প্রথমেই ভাবতে হয় আমি যদি অপরাধী হতুম তাহলে কি করতুম। যাক্‌গে, বাথরুমের কাজ সারা হয়েছে। চল, এবার লাইব্রেরীতে যাই। ওঁরা অনেকক্ষণ বসে আছেন।"

যাবার মুখে হঠাৎ শশাঙ্ক দরজার কাছ থেকে এক টুকরো কাগজ তুলে নিল। আমাকে দেখিয়ে বলল, "এটা কি বলতে পারো?"

—"না।"

—"এগুলো মরফিল ট্যাবলেটে জড়ানো কাগজ। প্রবল অনিদ্রা-রোগ থাকলেও এতে ঘুম এনে দেয়।"

তারপর হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলল, "হত্যাকারী অসম্ভব পাকা লোক, নিখিল! আস্ত শয়তান—"

—"কি বলছো তুমি শশাঙ্ক?"

—"কিছু না," বলে একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে বেরিয়ে এলো। আমিও তার অনুগমন করলুম।

সাত

লাইব্রেরীতে সবাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। রাজা-বাহাদুর একটা কৌচের উপর বসে বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কে জানে তাঁর মনের মধ্যে কি ঝড় উঠচে! সবাই অত্যন্ত বিমর্ষ, প্রত্যেকেই হয়ত অপরকে হত্যাকারী মনে করছে।

শশাঙ্ক বিশেষ কিছু ভূমিকা না করেই বলল, "রাজা-বাহাদুরের অনুমতিক্রমে পুলিশ না আসা পর্য্যন্ত আমিই এই তদন্তের ভার নিয়েছি। যতক্ষণ না প্রমাণ করা যাচ্ছে যে বাইরে থেকে কোন লোক এসেছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধরে নিতে হবে যে, আমাদেরই কেউ মন্টুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে।"

একটু থেমে আবার বলল, "অতএব আমাদের কর্ত্তব্য হলো পুলিশ আসবার আগেই হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা। প্রথমেই দেখতে হবে বাইরে থেকে কেউ এসেছিল কিনা।

আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় যে, কাল সন্ধ্যা থেকেই আজ সকাল

পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয়েচে। কেউ যদি বাইরে থেকে এসে থাকে অথবা কেউ যদি বাইরে গিয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই কাদার উপর তার পায়ের দাগ পাওয়া যাবে। আপনারা অনুগ্রহ করে নতুন দাগ সৃষ্টি করবার জন্য বাইরে বেরুবেন না—আমি এবং নিখিল পায়ের দাগ পরীক্ষা করতে যাচ্ছি। আমার ইচ্ছা, আমরা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আপনারা এখানেই অপেক্ষা করুন।"

বাইরে এসে শশাঙ্ক বলল, "এখানে রামচরণ আর রজনীবাবুর পায়ের ছাপ অবশ্য পাওয়া যাবেই। প্রথমেই সেইগুলো বার করা যাক্।"

বলে সে নীরবে পদচিহ্নের অনুসন্ধান করতে লাগল। হঠাৎ একসময় সে বলে উঠল, "দেখ নিখিল, গেটের বাইরে ঐ রজনীবাবুর গাড়ী আর সেখান থেকে তার পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে।"

তাকিয়ে দেখি, সত্যই পায়ের দাগ রয়েছে। আমি আশা করেছিলাম মাত্র একসারি দাগ দেখতে পাবো গাড়ী থেকে বাড়ীর দিকে —কিন্তু এ যে তিন সারি!

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, "রজনীবাবু প্রথমে একবার বাড়ীর ভিতরে গিয়ে গাড়ীতে ফিরে আসেন। তারপর আর একবার বাড়ীর ভিতরে গেছেন; কিন্তু কেন তিনি ফিরে এসে আবার গেলেন?"

শশাঙ্ক বলল, "শুধু তাই নয়। প্রথমবার যাবার অনেকক্ষণ পরে তিনি দ্বিতীয়বার বাড়ীর মধ্যে গেছেন। প্রথমবার যাওয়া-আসার দাগ দেখ অল্প গভীর—তখনও মাটি খুব বেশী নরম হয়নি কিনা! তারপর দ্বিতীয়বার যখন গেছেন, তখন পায়ের ছাপ মাটির ভিতরে কত বসে

গেছে! নিশ্চয় মাটি তখনকণে খুব বেশী নরম হয়ে গিয়েছিল। আমার তো মনে হয়, রজনীবাবু প্রথমবার ফিরে এসে গাড়ীতে অন্ততঃ ঘণ্টা-দু-এক বসেছিলেন, তারপর দ্বিতীয়বার সকাল সাড়ে পাঁচটা আন্দাজ বাড়ীর ভিতরে যান—তখন আমরা মণ্টুর মৃতদেহ পরীক্ষা করছি।"

শশাঙ্কের কথায় আমার মনে এক নতুন ধরণের সন্দেহ উপস্থিত হলো। তবে কি রজনীবাবুই গভীর রাত্রে গাড়ী করে এসে মণ্টুকে খুন করে মৃতদেহ তাঁর দাদার বিছানায় রেখে গাড়ীতে ফিরে গেছেন? আবার ভোর বেলা এমন ভাবে এসেছেন যেন তিনি এইমাত্র গাড়ী করে সহর থেকে এলেন, এ ব্যাপারের কিছুই জানেন না! শশাঙ্কের মুখের দিকে তাকালুম। তার চোখের দৃষ্টিও সংশয়-সঙ্কুল।

গেটের কাছে আরও দু'সারি পদচিহ্ন দেখা গেল—কাদা বাঁচাবার জন্য যে ওয়েলিংটন বুট ব্যবহার করা হয়, তার দাগ। একসারি বাড়ী থেকে গেটের বাইরে খানিকদূর পর্য্যন্ত গেছে, আর একসারি বাড়ীর দিকে এসেছে!

আমি বললুম, "এই ছাপগুলোয় আমাদের তদন্তের অনেক সাহায্য করবে। এতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কেউ বুট পরে বাইরে থেকে বাড়ীর মধ্যে এসেছিল, তারপর আবার ফিরে গেছে।"

—"আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে, কেউ বাড়ী থেকে বুট পরে বাইরে গিয়ে আবার বাড়ীতেই ফিরে এসেচে! দেখা যাক্ গেটের বাইরে কতদূর পর্য্যন্ত দাগগুলো দেখা যায়!"

সেই বুটপরা পায়ের দাগ লক্ষ্য করে আমরা একটা অদ্ভুত জিনিষ আবিষ্কার করলুম। গেটের বাইরে প্রায় শ'দুই হাত দূরে বুটের চিহ্ন হঠাৎ শেষ হয়েচে।

boiboi.net

শশাঙ্ক বলল, "তোমার কথাই যদি সত্য হয়, তবে দাগগুলো এখানেই শেষ হলো কেন? সেই বুটপরা লোক যদি বাইরে থেকেই এসে থাকে, তবে এখানে এসে আর দাগ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? এইখান থেকে কি সে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে? সাইকেল বা অন্য কোন রকম গাড়ীর দাগও তো কাছাকাছি নেই! তবে?—না নিখিল, আমার অনুমানই ঠিক। কোন লোক বুটপায়ে বাড়ীর ভেতর থেকে এই পর্য্যন্ত এসে আবার বাড়ীতেই ফিরে গেছে।"

একটু দূরেই খালি পায়ের তিনসারি দাগ দেখা গেল—বাইরের দিকে চলে গেছে। নিশ্চয়ই সেগুলো রামচরণের। সে থানায় গেছে দুবার—কাল রাত্রে গিয়ে ফিরেচে, আজ আবার গেছে, এখনও ফেরেনি।

হঠাৎ আমার ডাক্তার ঘোষের ভিজে ছাতার কথা মনে পড়ে গেল। বললুম, "ডাক্তার ঘোষই কি বুট পায়ে দিয়ে বাইরে এসেছিলেন? হয়ত গেটের সেই শয়তানটার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই—"

—"খুবই সম্ভব।"

শশাঙ্ক আরও কিছুক্ষণ নীরবে জমিটা পরীক্ষা করল। তারপর বলল, "যা দেখবার ছিল দেখা হয়েচে। চল, ফিরে যাই।"

বাড়ীর মধ্যে ফিরবার অল্প একটু পরেই রামচরণ ফিরে এলো; বলল, "দারোগাবাবু আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আসচেন। বললেন, আপনি যখন আছেন তখন আর বেশী তাড়াহুড়া করবার দরকার নেই।"

শশাঙ্ক সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, "রামচরণ, কাল রাত্রে থানা থেকে ফিরে তুমি কি সদর দরজা বন্ধ করেছিলে?"

রামচরণ একটু দ্বিধা করে বলল, "ভুলে গিয়েছিলুম বাবু! কাল রাতে থানায় আপনার চিঠি দিয়ে ফিরতে-ফিরতে রাত প্রায় একটা হয়ে গেল। যখন দরজার কাছে এসেছি তখন মনে হলো, দোতলায় ধপ্ করে একটা আওয়াজ হলো। অত রাত্রে সবাই ঘুমিয়েছে। তাই শব্দটা শুনে আমার কেমন অস্বাভাবিক মনে হলো, তাড়াতাড়ি ছুটে উপরে গেলুম। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলুম না। তারপর আর নীচে এসে দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছি।"

উত্তরে শশাঙ্ক হাঁ বা না কিছুই বলল না। রামচরণ চলে যাচ্ছিল, শশাঙ্ক ডেকে বলল, "খুঁজে দেখ, এ বাড়ীর কোথাও এক জোড়া ভিজে কাদামাখা ওয়েলিংটন বুট পাও কিনা। তারপর সবাইকে চা দিয়ে যাবে। তুমি নিজে আসবে, আর কারুর হাতে পাঠাবে না। আর দেখো, চাকরদের মহলে বলে দাও, কেউ যেন আমার অনুমতি ছাড়া তাদের মহল ছেড়ে না বেরোয়, এ-মহলেও না আসে।"

রামচরণ ঘাড় নেড়ে চলে গেল। আমরা লাইব্রেরী-ঘরে ফিরে এলুম।

শশাঙ্ক সবাইকে উদ্দেশ করে বলল, "মাটির উপরে আমরা যে দাগ দেখতে পেয়েছি, তাতে বোঝা যায় যে বাইরে থেকে কোন লোক আসেনি; কিন্তু এমন চিহ্ন পাওয়া গেছে যে বাড়ীর ভিতরের কেউ একজন রাত্রিতে বাইরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কে?"

শশাঙ্ক উত্তরের আশায় একে-একে সবার মুখের দিকেই তাকাল; কিন্তু সবাই চুপ।

—"আপনারা কেউই স্বীকার করেছেন না," শশাঙ্ক বলল, "অথচ আমাদের ভিতরে নিশ্চয়ই বাইরে কেউ গিয়েছিল। আপনাদের

কাছ থেকে স্বেচ্ছায় কোন সাহায্য যখন পাচ্ছি না, তখন পুলিশকে একথা আমার জানাতেই হবে। বুঝতেই তো পারছেন, পুলিশের লোক সব সময় খুব ভদ্র ব্যবহার করে না।"

রাজা-বাহাদুর শশাঙ্কের দিকে তাকিয়ে ক্লান্তকণ্ঠে বললেন, "শশাঙ্ক, পুলিশের হাঙ্গামা কি কিছুতেই এড়ান যায় না?"

—"যায়—যদি আমরা আগেই হত্যাকারীর সন্ধান করতে পারি।" শশাঙ্ক বলল।

সমর বলল, "সে আশা ছেড়ে দিন, শশাঙ্কবাবু! রাতে কে বাইরে গিয়েছিলো এই সামান্য কথাটাই যখন স্বীকার করছে না, তখন আপনি কি আশা করেন যে হত্যাকারী আপনি এসে দোষ স্বীকার করে ধরা দেবে?"

—"কিন্তু অনুসন্ধান করেও তো হত্যা-রহস্যের কিনারা করা যেতে পারে!"

রজনীবাবু বললেন, "শশাঙ্কবাবু যে প্রস্তাব করেছেন, তার চাইতে ভাল প্রস্তাব আর কিছু হতে পারে না।"

ধরণীবাবুও সায় দিলেন একথায়, বললেন, "বেশ তো! কিন্তু শশাঙ্কবাবু কিরকম ভাবে আরম্ভ করতে চান?"

রাজা-বাহাদুরের মুখেও একই প্রশ্ন-চিহ্ন ফুটে উঠলো।

শশাঙ্ক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "বেশ, আমাকে যদি এই কাজের ভার নিতে হয়, তাহলে আমি প্রথমেই আপনাদের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবো। আশা করি তাতে আপনাদের কোন আপত্তি হবে না।

আপনারা সবাই এই ঘরে থাকুন। আমি রাজা-বাহাদুরের

বসবার ঘরে যাচ্ছি। আমি এক-একজনকে ডেকে পাঠাব। নিখিল, তুমি আমার সঙ্গে এসো।"

তারপর পিসীমার দিকে ফিরে বলল, "আপনিই প্রথম মণ্টুকে ওই অবস্থায় দেখেছেন—অতএব আপনিই প্রথম আসুন।"

আট

শশাঙ্ক বলল, "আপনিই প্রথমে মণ্টুকে ধরণীবাবুর বিছানায় দেখতে পান; কিন্তু আপনি অত ভোরে সেখানে গিয়েছিলেন কেন?"

একটা মানসিক উত্তেজনায় পিসীমা ভাল করে কথা বলতে পারছিলেন না, অত্যন্ত ধীরে-ধীরে বললেন, "আমি সেখানে গিয়েছিলাম দুটি কারণে। প্রথমতঃ আমার মনে হলো আমি যেন একটা শব্দ শুনতে পেলুম! আর দ্বিতীয়তঃ আমার মনে হয়েছিল, কোথা থেকে যেন পোড়া গন্ধ আসচে!"

—"সেই শব্দে অথবা গন্ধেই কি আপনার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল?"

—"না, আমি আগে থাকতেই জেগেছিলুম। বয়স হয়েচে কিনা, এখন আর ভাল ঘুম হয় না।" পিসীমা ম্লান-হাসি হাসলেন।

—"আপনি কি উঠে কোথাও আগুন দেখতে পেয়েছিলেন?"

—"না।"

—"রোজই কি আপনার এই রকম ঘুম হয়না নাকি?"

—"বললুম তো বয়স হয়েছে, এমনিই ভাল ঘুম হয় না। তাছাড়া কাল রাতে বিশেষ করে বৌদিদির কথা ভাবছিলুম।"

—"আপনি বলেছেন আপনি কিসের একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। সেটা কিসের শব্দ?"

—"আমার মনে হয়েছিল, কে যেন বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে! আমাদের বাড়ীতে অত ভোরে কেউ ওঠে না, তাই আশ্চর্য্য মনে হয়েছিল।"

—"উঠে কাউকে দেখতে পেলেন?"

—"না।"

—"তবে ধরণীবাবুর ঘরে গেলেন কি করে?

—"বারান্দার উপরেই ধরণীর ঘর। দরজা খোলাই ছিল। আমার হাতে টর্চ্চ ছিল একটা। দেখলুম, মণ্টু ধরণীর সঙ্গে শুয়ে আছে। মণ্টু এ-বাড়ীতে প্রায় ছ'-সাত বছর আছে, কিন্তু কখনও কারুর সঙ্গে শোয়া ও পছন্দ করত না। তাই ওকে ওইরকম ভাবে শুয়ে থাকতে দেখে আমার ভারী আশ্চর্য্য লাগে। তাছাড়া দেখলুম, ওর পা-দুটো পুরোপুরি খাট থেকে বেরিয়ে আছে। ভাবলুম, পা-দুটো বিছানার উপর তুলে দিই। কিন্তু পায়ে হাত দিয়েই দেখি, ঠাণ্ডা আর ভীষণ আড়ষ্ট! ওই দেখে আমার কেমন যেন একটা ভয় হলো! তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে এলুম। এমন সময় নিখিলের সঙ্গে দেখা।"

—"আচ্ছা পিসীমা, মণ্টুকে আপনি ভালবাসতেন?"

মুহূর্ত্তের মধ্যে পিসীমার মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল। একটুকাল চুপ করে থেকে বললেন, "আমি ওকে ভালই বাসতুম।"

শশাঙ্ক ফস্ করে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার দাদা ওকে পোষ্য নেবার পরেও?"

পিসীমা হঠাৎ রেগে উঠলেন, একটু চেঁচিয়েই বললেন, "চালাকি করো না শশাঙ্ক! তুমি কি ভেবেছো যে দাদা ওকে দত্তক নেওয়ায় আমি রাগ করে মণ্টুকে—"

তিনি আর শেষ করতে পারলেন না। শশাঙ্ক তিরস্কারটা গায়ে না মেখেই ফের বলল, "আপনাকে আরও দু'-একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনার বৌদি যে খুন হতে পারেন, এ-কথা কি আপনার কখনও মনে হয়েচে?"

—"না, কক্ষণো না! সে তার বাপের বাড়ী গিয়েছিল। তবে পথে যদি কোথাও মারা গিয়ে থাকে, সে আলাদা কথা।"

—"আপনি কি করে জানলেন যে তিনি বাপের বাড়ী গিয়েছিলেন?"

—"আমি শুনেছি তার দাদা এসেছিল, তার সঙ্গেই সে গেছে।"

—"আমাদের তদন্তে সাহায্য হ'তে পারে এমন আর কিছু আপনি বলতে পারেন?"

পিসীমা দু'তিন মিনিট চুপ করে ভাবলেন। তারপর বললেন, "একটা কথা আমার মনে হচ্ছে, তাতে তোমাদের সাহায্য হবে কিনা বলতে পারিনে।

আমার দাঁতে মাঝে-মাঝে খুব যন্ত্রণা হয়, আর সঙ্গে-সঙ্গে গা-বমি করতে থাকে। কাল সন্ধ্যায় কেমন গা বমি-বমি করতে লাগল। ভাবলুম, স্নান করলে সুস্থ বোধ করব। আমার ঘরের পাশেই কলঘর। সেখানে যাবার পরে মনে হলো, আমার ঘরে কে যেন ঢুকল! আমার ঘরে কেউ সাধারণতঃ ঢোকে না, তাই সন্দেহ হলো; কিন্তু বেরিয়ে এসে কাউকে দেখতে পেলুম না।"

—"কে আসতে পারে বলে আপনার মনে হয় ?"

—"বিশেষ করে কাউকেই সন্দেহ হয় না।"

—"আর একটিমাত্র প্রশ্ন। এ-বাড়ীতে কেউ ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করে বলে জানেন ?"

—"আমিই করি।"

—"কেন ?"

—"আমার দাঁতে যন্ত্রণা হলে ক্লোরোফর্ম লাগালে ব্যথা কমে যায়।"

—"এ-কথা এ-বাড়ীতে কে-কে জানে ?"

—"সবাই জানে—আমি বহুদিন থেকে ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করছি।"

—"আপনার ক্লোরোফর্মের শিশি রাখেন কোথায় ?"

—"কেন ? আমার ড্রয়ারে !"

—"দেখাতে পারেন ?"

এই প্রশ্নে পিসীমা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলেন ; তবু বললেন, "নিশ্চয় পারি—যাবে দেখতে এখন ?"

—"চলুন।" বলে শশাঙ্ক উঠল। আমাকেও সঙ্গে যেতে বলল।

পিসীমা তাঁর ঘরে এলেন। এসেই ড্রয়ার খুলে বললেন, "এই দেখ !" কিন্তু তারপরেই হঠাৎ চেঁচিয়ে বললেন, "কই ? ক্লোরোফর্মের শিশি তো এখানে নেই ! কে নিলে ?"

শশাঙ্ক ভাল-মানুষের মত বলল, "অন্য কোনও ড্রয়ারে তো রাখতে পারেন !"

—"মোটেই না। গত দশ বছর ধরে আমি এই ড্রয়ারে রাখছি, আর আজ ভুল হবে ?"

তবু সব ড্রয়ার, বাক্স প্রভৃতি দেখা হলো, কিন্তু কোথাও ক্লোরোফর্মের শিশির উদ্দেশ মিলল না। হঠাৎ পিসীমার মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখা দিল, আমতা-আমতা করে বললেন, "তাই তো, কি হলো ? ভারী আশ্চর্য্য তো !"

শশাঙ্ক মৃদুকণ্ঠে বলল, "আপনার কি মনে হয়, যে লোকটা কাল সন্ধ্যায় আপনার ঘরে ঢুকেছিল, সে-ই ক্লোরোফর্মের শিশি চুরি করেছে ?"

পিসীমা যেন অকূলে কূল পেলেন ! তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "নিশ্চয়ই। তাছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।"

এরপরে তিনজনেই বসবার ঘরে ফিরে এলুম।

শশাঙ্ক আবার প্রশ্ন করল, "আপনি ক্লোরোফর্ম কোত্থেকে পান ?"

পিসীমা বললেন, "রাজবাড়ীর পিছনে খানিকটা দূরে একটা ছোট ডাক্তারখানা আছে। সেখান থেকেই মাঝে-মাঝে রামচরণকে দিয়ে আনাই।"

—"শেষ কবে আনিয়েছেন ?"

—"তা প্রায় মাসখানেক হবে।"

—"আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন। যাবার সময় আপনার দাদাকে পাঠিয়ে দেবেন।"

পিসীমা ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একটু পরেই রাজা-বাহাদুর এসে ঘরে ঢুকলেন। শোকে এবং দুশ্চিন্তায় তিনি যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন ! তিনি ধরা গলায়

বললেন, "শশাঙ্ক, আমার বাড়ীতে একি হলো? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!"

শশাঙ্ক অত্যন্ত দরদের সঙ্গে বলল, "কাকাবাবু, আপনি অত বিচলিত হবেন না। আমি বুঝতে পারছি এই ঘটনাটা আপনাকে কিরকম মর্মান্তিক ভাবে আঘাত করেছে! কিন্তু যা হবার তাতো হয়েই গেছে।"

রাজা-বাহাদুর কিছু বললেন না, শুধু অস্থিরভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে একটু সামলে নিয়ে বললেন, "মণ্টুকে দত্তক নেওয়ায় সবারই আপত্তি ছিল। এমন কি, মণি, সমর, ধরণী, রজনী এদের সবার স্বার্থেই আঘাত লেগেছে; কিন্তু তাই বলে ওদের কেউ মণ্টুকে হত্যা করবে, এ আমি ভাবতেও পারিনে।"

এতক্ষণে শশাঙ্ক উত্তর দিল; বলল, "কিন্তু তাহ'লেও মণ্টু যে খুন হয়েছে, সেটা তো ঠিক!"

—"কিন্তু আমাদের কেউ এ-কাজ করেনি, এই আমি বলতে চাই।"

—"সে-কথা নিয়ে আলোচনা করে তো আর লাভ নেই। কাকাবাবু, আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।"

—"বল", রাজা-বাহাদুর ধীরস্বরে বললেন।

—"কাল রাত্রে আপনার কেমন ঘুম হয়েছিল?"

—"বুঝতেই তো পার—কাল রাত্রে মোটেই ভাল ঘুম হয়নি।"

—"রাত্রে আপনি কোন শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন?"

—"না। সমর সকালবেলা আমাকে ডাকতে আসবার আগে আমি কিছুই শুনিনি! আমার শুনবার শক্তিই বোধ হয় আগের চাইতে কমে গেছে!"

—"আচ্ছা, আপনি বলেছেন, মাত্র মাস-দু'এক আগে ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে আপনার কেবল একদিনই দেখা হয়েছিল। আর আপনি তাঁকে বিশ্বাস করে দু'লাখ টাকা দিতে চাইছেন প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্য! ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য্য নয় কি?"

—"কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছো তার সঙ্গে আমার চিঠিপত্রের আলাপ অনেক দিনের। তাছাড়া, তার খ্যাতিও তো খুব।"

—"আপনি কি মনে করেন তিনি পৃথিবীর মধ্যে একজন বিশিষ্ট প্রেততত্ত্ববিদ্?"

—"নিশ্চয়ই—তাতে আর সন্দেহ আছে?"

—"আপনি বলেছেন প্রথমবার আপনি অসুস্থ থাকায় মণ্টু আপনার হয়ে ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে সে আপনাকে কি বলেছিল?"

—"মণ্টু বলেছিল যে ডাক্তার ঘোষ একদিন আমাকে দেখতে আসবেন।"

—"শুধু এই?"

—"হ্যাঁ। কারণ, আমি তাকে শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলাম ডাক্তার ঘোষ কবে আসবেন?"

—"বেশ। আপনাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার নেই। যাবার সময় সমরকে এখানে পাঠিয়ে দেবেন।"

রাজা-বাহাদুর ধীরে-ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

বোর্ডিং-এর ঠিকানা
নাম
রোল
ক্লাস

নয়

সমর মণি-পিসীমার ছেলে। অল্প বয়স—কুড়ি-বাইশ বছর মাত্র। পিসীমার ইচ্ছা ছিল, রাজা-বাহাদুর দত্তক যদি নেনই তবে যেন সমরকেই নেন।

শশাঙ্ক প্রশ্ন করল, "মণ্টুকে তুমি ভালবাসতে সমর?"

সমর সহজভাবেই বলল, "বরাবর প্রায় কলকাতায় হষ্টেলে থাকতুম। মণ্টুর সঙ্গে দেখাই হত অতি অল্প। তাই ভালবাসা-না-বাসার প্রশ্নই ওঠে না।"

—"তোমার মার ইচ্ছা ছিল যে রাজা-বাহাদুর তোমাকেই যেন দত্তক নেন। তাতে তোমার মত কি?"

—"মামা রাজী হলে আমি আপত্তি করতুম না।"

—"তুমি কাল বিকেলে বাড়ী ফিরেছো কখন?"

—"ঠিক সন্ধ্যার সময়।"

—"বাড়ী ফিরবার আগে কোথায় গিয়েছিলে?"

—"আমি রমেশ ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারীতে গিয়েছিলাম।"

—"কেন?"

—"কয়েকদিন ধরে রাতে আমার একদম ঘুম হচ্ছিল না। তাই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলুম একটা ঘুমের ওষুধ আনবার জন্য।"

—"ওষুধ পেলে?"

—"হ্যাঁ। ডাক্তারবাবু কয়েকটা এ্যাস্‌প্রো-ট্যাবলেট দিলেন।"

—"তার সবগুলোই খেয়েছো?"

অতর্কিতে দারুণ এক ঘুষি বসিয়ে দিলে।

—"না, কয়েকটা আছে ?"

—"আনতে পার ?"

—"নিশ্চয়ই।"

—"থাক্ দরকার নেই ; কিন্তু কাল রাত্রে তুমি ধরণীবাবুর ঘরে গিয়েছিলে কেন ?"

"আমি যাইনি তো !" সমর বলল।

শশাঙ্ক প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, "মিথ্যাবাদী কোথাকার ! তুমি গেছো কিনা তা আমি জানতে চাইনি—আমার প্রশ্ন হলো কেন গিয়েছিলে ?"

সমর শশাঙ্কের কাছ থেকে এ রকম ধমক একেবারেই আশা করেনি। তাই অনেকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "আপনি এরকম সন্দেহ করছেন কেন ?"

—"সন্দেহ করছি কেন ? এ-বাড়ীতে একমাত্র তুমিই সিগারেট খাও। অস্বীকার করতে চেষ্টা করো না। ধরণীবাবুর ঘরে আমি সদ্য-খাওয়া একটা সিগারেটের টুক্‌রো পেয়েছি।"

—"কিন্তু সেটা যে আমিই খেয়ে ফেলেছি তার প্রমাণ কি ?" সমর একটু উদ্ধতভাবে জবাব দিল।

—"লুকিয়ে লাভ নেই সমর ! তুমি জার্ম্মাণ ডাক্তার কার্ল ল্যান্ডষ্টীনারের নাম শুনেছো ?—নোবেল প্রাইজওয়ালা ? জান বোধহয় যে রক্তের মধ্যে দু'-রকম কণিকা আছে—লাল কণিকা এবং সাদা কণিকা ! এবং ভিন্ন-ভিন্ন লোকের রক্তে ভিন্ন-ভিন্ন পরিমাণ লাল এবং সাদা কণিকা থাকে। এই ডাক্তার-সাহেব দেখিয়েছেন যে, যে কোন লোকের থুথু পরীক্ষা করেই বলে দেওয়া যায় তার রক্তের মধ্যে

লাল কণাই বা কত আর সাদা কণাই বা কত ! বুঝলে ? এখন তুমি যে সিগারেটের টুক্‌রোটা ফেলে এসেছ, তার গায়ে তোমার থুথু লেগে আছে নিশ্চয়ই। সেই থুথু এবং তোমার রক্তের কেমিক্যাল এ্যানালিসিস্ করলেই ধরা পড়বে তুমি সিগারেট খেয়েচ কিনা—বুঝলে এবারে ?"

সমর আর অস্বীকার করতে পারল না। বাধ্য হয়েই বলল, "যাক্, অস্বীকার করার আর পথ নেই যখন, তখন স্বীকারই করছি, হ্যাঁ, আমি কাল ধরণীদা'র ঘরে গিয়েছিলুম।"

—"এই তো ভাল ছেলে হয়েচ দেখচি ! কিন্তু গিয়েছিলে কেন ?"

—"আপনাকে বলেছি তো রাত্রে ভাল ঘুম হচ্ছিল না। এ্যাস্‌প্রো খেলুম তাতেও বিশেষ ফল হলো না। ভাবলুম, গা-হাত-পায়ে ঠাণ্ডা জল দিয়ে আসি, তবে যদি ঘুম আসে !

ধরণীদা'র ঘরের সামনে একটা কুঁজো থাকত। গেলুম সেখানে ! বাতি জ্বেলে দেখি, মণ্টু ধরণীদা'র সঙ্গে শুয়ে আছে, আর ওর শরীরের প্রায় অর্দ্ধেকটাই খাটের বাইরে ঝুলচে। আমি ভাবলুম, ওর পাটা তুলে দিই খাটের উপর ; কিন্তু তুলে দিতে গিয়েই বুঝলুম, মণ্টু মারা গেছে। তখন খুব ভয় হলো। পাছে কোন হাঙ্গামায় পড়তে হয়, তাই কোন গোলমাল না করে নিজের ঘরেই চলে গেলুম।"

—"কি হাঙ্গামায় তুমি পড়তে পারতে ?"

—"কেন ? পুলিশের !"

—"পুলিশ তোমাকে টানাটানি করতে পারে এ-কথা তোমার মনে এলো কেন ?"

—"তখন ঠিক কি ভেবেছিলাম মনে নেই। তবে বোধ হয় ভেবেছিলাম, পুলিশে মনে করবে যে যখন আমাকে পোষ্য-নেবার কথা ছিল অথচ শেষ পর্য্যন্ত মণ্টুকেই নেওয়া হলো তখন আমিই হয়ত আমার পথের কাঁটা দূর করবার জন্য—না-না শশাঙ্কবাবু, আমি এ-কাজ করিনি, আপনি বিশ্বাস করুন !"

শশাঙ্ক হঠাৎ বলল, "আচ্ছা, তুমি যেতে পারো—কুণালকে পাঠিয়ে দিও।"

সমর চলে যেতে শশাঙ্ক রামচরণকে ডাক দিল। রামচরণ দরজার কাছেই হাজির ছিল। ডাক শুনে কাছে এসে দাঁড়াল। শশাঙ্ক বলল, "তুমি এক্ষুণি রমেশবাবু-ডাক্তারকে রাজা-বাহাদুরের নাম করে ডেকে নিয়ে এসো।"

রামচরণ বেরিয়ে গেল।

দশ

বিবর্ণ মুখে কুণাল এসে ঘরে ঢুকল। শশাঙ্ক তাকে বসতে বলে নিজে পাইপ ধরাল। কুণাল কোন কথা বলল না, একটা কথাও না।

পাইপে কয়েকটা টান দিয়ে শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করল, "কুণাল, তুমি বাড়ী থেকে পালিয়েছিলে কেন ?"

কুণালের মুখ আরো বিবর্ণ হয়ে গেল। হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ করে সে অনেকটা মরিয়া হয়েই বলল, "সে আমি বলতে পারব না।"

শশাঙ্ক অত্যন্ত কোমল ভাবে বলল, "কেন বলবে না ভাই ? সব কথা না বললে দোষী ধরা পড়বে কি করে ? মণ্টুর মৃত্যুতে

রাজা-বাহাদুর কি রকম আঘাত পেয়েছেন দেখেছো তো? তাছাড়া পুলিশ তো ছাড়বে না, টানা-হ্যাঁচড়া করবেই।"

কিছুক্ষণ কুণাল ঠিক করতে পারল না, কি করবে—বলবে, কি বলবে না!

কুণালের দ্বিধার ভাব দেখে শশাঙ্ক আবার বলল, "কুণাল, আমি তোমার দাদার মত। আমার কাছে লজ্জা করো না।"

কুণাল আর আপত্তি করল না, বলল, "বেশ, বলছি। একটু বসুন, আমি একটা জিনিষ নিয়ে আসি।" এই বলে সে বেরিয়ে গেল।

মিনিট-পাঁচেক পরে সে যখন ফিরে এল, তখন তার মুখ দেখে মনে হলো সে যেন এইমাত্র কাঁদছিল! তার হাতে একখানা পুরাতন, বিবর্ণ কাগজ—সম্ভবতঃ কোন চিঠি। সে কাগজখানা শশাঙ্কের সামনে মেলে ধরে বলল, "এই দেখুন।"

কাগজখানা সত্যই অত্যন্ত পুরাতন একখানা চিঠি—মেয়েলি হাতে লেখা। চিঠিখানা এই—

২২শে অক্টোবর, ১৯৩৪

শ্রীচরণেষু,—

অনেক দিন ধরেই তোমাকে একটা কথা বলব বলব ভাবছিলুম, কিন্তু কিছুতেই আর সাহস করে বলতে পারছিলুম না। আজ তুমি কলকাতা গেছো, তাই তোমাকে চিঠিতে আমার মনের কথা লিখছি।

তোমাদের বাড়ী সম্বন্ধে আমার ভয় জন্মেছে। আমার বিশ্বাস, তোমাদের বংশ খুনীর বংশ। মনে করো না, এ-সব আমার কল্পনা অথবা আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! এই জাতীয় কথা আমি দু'-একজন পুরানো চাকরের মুখে শুনেছি। তোমার

কাছে শুনেছি, তোমার ঠাকুরমা অসাবধানে ছাত থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছেন; কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমার ঠাকুরদাই তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়েছেন। তোমার মা শুনেছি ভুলে মালিশের ওষুধ খেয়ে মারা গেছেন; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার বাবাই তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরেছেন।

অতি প্রাচীনকালে তোমরা দস্যুতা করে জমিদারী করেছো, লুটপাট করেছো, মানুষ খুন করেছো। সেই হত্যার বীজ তোমাদের বংশের প্রত্যেকের রক্তের মধ্যে লুকিয়ে আছে। বাইরের দৃষ্টিতে তোমরা স্বাভাবিক, সুস্থ। তোমরা নিজেরাও হয়ত বোঝো না যে, তোমাদের রক্তের মধ্যে কি প্রবৃত্তি রয়েছে! সুযোগ এবং সুবিধা পেলে তোমাদের বংশের প্রত্যেকটি প্রাণী খুন করতে পারে—সম্পূর্ণ অকারণেও খুন করা তোমাদের পক্ষে বিচিত্র নয়। তাই আমার ভয় হয়, কুণালের জন্য, তোমার জন্য। যদি তোমাদের বংশের অভিশাপ তোমাদের মধ্যে জেগে ওঠে! তাই আমি কি করব ঠিক করতে পারছি না।

তোমার বংশের ইতিহাস শুনে আমার ভয় হয়, যদি তোমাদের বংশের কেউ কোন দিন আমাকে বা কুণালকে—মাঝে-মাঝে মনে হয়, কুণালকে নিয়ে দূরদেশে কোথাও চলে যাই, যেখানে তোমাদের বংশের কেউ নেই। কিন্তু সে কি সম্ভব? আমি তোমার কাছেই জিজ্ঞাসা করি, আমি কি করব? ইতি—

সরোজিনী

অদ্ভুত ধরণের চিঠি! পেনসিলে লেখা। শশাঙ্ক উল্টে-পাল্টে চিঠিখানা দেখল। তারপর বিস্মিত কণ্ঠে বলল, "এ চিঠি তুমি পেলে কোথায়?"

—"এ চিঠি আমরা পেয়েছি একটা পুরানো বইয়ের মধ্যে।"

—"আমরা ? আমরা কে কে ?"

কুণাল জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, "সত্যি কথা বলতে কি, চিঠিখানা পেয়েছিল মণ্টু।"

—"কবে ?"

—"প্রায় ছ'মাস আগে—এই চিঠি পাবার কিছুদিন পরেই আমি পালিয়ে যাই।"

—"মণ্টু তাহ'লে চিঠিটা পেয়েই তোমাকে দিতে এলো ? ভারী আশ্চর্য্য ত ! চিঠিখানা তোমার বাবাকে লেখা অথচ মণ্টু তোমাকে দিলে !"

—"মণ্টু আমাকে ঠিক দেয়নি, আমিই বরং তার কাছ থেকে জোর করে চিঠিটা নিয়েছিলুম। একদিন মণ্টু আর ললিত ড্রাইভার একটা কাগজ নিয়ে কি সব আলোচনা করছিল, এমন সময় আমি সেখানে গিয়ে পড়ি। ওরা দুজনেই কেমন যেন থতমত খেয়ে চুপ করে গেল। মণ্টু চট্ করে কাগজখানা কাপড়ের তলায় লুকিয়ে ফেললে। এই দেখে আমার কৌতূহল হয়। আমি জেদ করতে থাকি যে, কাগজটা আমাকে দেখাতেই হবে। তখন মণ্টু চিঠিখানা আমার হাতে দেয়। এই চিঠির সঙ্গে মার আকস্মিক অদৃশ্য হয়ে যাওয়াকে মিলিয়ে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বাবাই আমার মাকে—"

কুণাল আর বলতে পারল না। কান্নায় তার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

শশাঙ্ক খানিকক্ষণ কুণালের পিঠে হাত রেখে তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করল। তারপর বলল, "তোমার মনে যদি এই সন্দেহই এসে থাকে, তবে তুমি তোমার বাবার কাছে চিঠিখানা নিয়ে গেলে না কেন ?"

—"বাবার কাছে ? অসম্ভব !"

—"তুমি তাহলে চিঠিটা পাবার পর কি করলে ?"

—"প্রথমেই বাবার উপর অসহ্য একটা ঘৃণার ভাব এলো। যে বাবাকে বরাবর শান্ত সংযত দেখে এসেছি, সেই কি না আমার মাকে ···না শশাঙ্কবাবু, আমার তখন বাবার মুখের দিকে পর্য্যন্ত চাইতে ইচ্ছে হত না। ক্রমেই রাজবাড়ী অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। আমার মনে হত, মার অশরীরী আত্মা যেন সর্ব্বদা কাঁদছেন। আমি আর সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে গেলুম। আর কিছুদিন এখানে থাকলে আমি নির্ঘাত পাগল হয়ে যেতুম। পালিয়ে গিয়ে কেবল মনে হত একমাত্র আত্মহত্যা করেই আমি এই সন্দেহ আর যন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তার পেতে পারি।"

প্রবল একটা যন্ত্রণায় কুণালের মুখ বারবার কুঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল। কুণাল একটু সামলে নিতে, শশাঙ্ক আবার প্রশ্ন করল, "চিঠিটা যে তোমার মার-ই লেখা, তা কি তুমি নিশ্চিত করে বলতে পারো ?"

—"নিশ্চয়ই ! মার কত হাতের লেখা আমার কাছে আছে।"

—"আমার তো মনে হয়, তোমার বাবাকে একবার চিঠিখানা দেখানো দরকার !"

—"কাল রাত্রে মণ্টু যা বলেছে, তার পরে এই চিঠি বাবাকে দেখাতে বলেন ?"

—"নিশ্চয়ই ! কারণ, প্রথমেই আমাকে জানতে হবে চিঠিটা জাল না খাঁটি এবং এটা সত্যি সত্যিই তোমার মার হাতের লেখা কি ! তোমার চাইতে মে [illegible] বাবাই তা ভাল বলতে পারবেন।

তোমার মা যখন চলে যান, তখন তো তোমার বয়স বারো-তেরোর বেশী নয়।"

এরপর শশাঙ্কের নির্দেশমত আমি রাজা-বাহাদুরকে ডেকে আনলুম। তিনি আসতে শশাঙ্ক নিঃশব্দে চিঠিখানা তাঁর হাতে তুলে দিল।

চিঠিখানা পড়ে রাজা-বাহাদুরের মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি জোর করে চেয়ারের হাতাটা চেপে ধরলেন। একটু পরে তিনি আবার চিঠিখানা পড়লেন। তারপর স্খলিত কণ্ঠে বললেন, "আমি—আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না? তোমরা এটি পেলে কোথায়?"

শশাঙ্ক প্রশ্ন করল, "চিঠিখানা আপনি আগে কখনও দেখেননি?"

—"কোন দিন না।"

—"কুণালের মা যখন চলে যান, তখনও নয়? ভাল করে মনে করে দেখুন দেখি!"

—"না, না, কোনদিন না! আজই আমি প্রথম দেখছি এ চিঠি!" রাজা-বাহাদুর আত্মহারা হয়ে বলে উঠলেন।

কুণাল বলল, "একটা বইয়ের মধ্যে এটা পাওয়া গিয়েছিল।"

শশাঙ্ক রাজা-বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করল, "কুণালের মা চলে যাবার সময় আপনাকে যে চিঠি লিখে রেখে যান, তার সঙ্গে কি এই চিঠির কোন মিল আছে?"

—"একেবারেই না।" রাজা-বাহাদুর কেন যেন হঠাৎ অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগলেন! অনেকটা নিজের মনেই বললেন, "এ অসম্ভব! একেবারে অসম্ভব!"

শশাঙ্ক প্রশ্ন করল, "কি অসম্ভব? আপনাদের রক্তে যে হত্যার প্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে, তাই?"

—"হাঁ, এ-রকম কথা আমি আমার জীবনে কখনও শুনিনি। কবে কোন্ চাকর ওকে কি বলেছে, আর তাইতেই সে ভয় পেয়ে গেছে! আমি নিজে জানি আমার ঠাকুরমা যখন ছাত থেকে পড়ে মারা যান, তখন আমার ঠাকুরদা এখানেই ছিলেন না—ছিলেন ঢাকায়। না, না, শশাঙ্ক, অসম্ভব!"

তারপর কুণালের দিকে ফিরে বললেন, "কুণাল, তুইও কি এই সব বিশ্বাস করিস?"

কুণাল ভগ্নকণ্ঠে বলল, "বাবা! আমি কি যে বিশ্বাস করব আর কি যে করব না, তা নিজেই বুঝতে পারছি না।"

—"কুণাল—খোকা!" রাজ-বাহাদুর হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন।

কুণাল দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

শশাঙ্ক আবার রাজা-বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করল, "লেখাটা কুণালের মার-ই?"

—"কে জানে? তবে যতদূর মনে হয়, তারই।"

কয়েক মিনিট সবাই চুপ করে রইল। হঠাৎ এক সময় রাজা-বাহাদুর অত্যন্ত কোমল সুরে ডাকলেন, "কুণাল—খোকা!"

কুণাল একটুকাল দ্বিধা করল, তারপর 'বাবা' বলে রাজা-বাহাদুরের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাজা-বাহাদুরের দুচোখ বেয়ে হু হু করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

এমন সময় দরজায় রামচরণ দেখা দিল। তার হাতে কাদা-মাখা একজোড়া ওয়েলিংটন বুট।

boiboi.net

শশাঙ্ক বলল, "কোথায় পেলে ?"

—"দোতলার সিঁড়ির নীচেই।"

শশাঙ্ক রাজা-বাহাদুরের দিকে একবার তাকাল, তারপর রামচরণকে জিজ্ঞাসা করল, "এ বুট-জোড়া কার জানো ?"

—"জানি—এ বুট ললিতের।"

শশাঙ্ক শুধু হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়ল।

ড্রাইভারের জুতো দেখে আমাদের আবার বিশেষ করে ললিতের কথা মনে পড়ল। শশাঙ্ক বুট-জোড়া ভাল করে দেখে রামচরণের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, "কাল বিকেলে ললিত যখন গাড়ী নিয়ে যায়, তখন তুমি তাকে দেখেছিলে ?"

—"হ্যাঁ, আমিই তাকে পাঠালুম।"

—"তখন কি সে এই বুট পায়ে দিয়ে গিয়েছিল ?"

—"না।"

—"তোমার ঠিক মনে আছে ?"

—"ঠিকই মনে আছে বাবু! কারণ, আমি ওকে ঠাট্টা করে বলেছিলুম, 'বুট পায়ে দেবে না ?' তাতে ও বলেছিল, 'গাড়ীতে যাব, গাড়ীতে আসব,—তাতে বুট পরবার কি দরকার ?' বলে ও জুতো-জোড়া সিঁড়ির তলায় তাকের উপর রেখে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেল।"

শশাঙ্ক অনেকটা নিজের মনেই বলল, "ভারী আশ্চর্য্য তো! জুতো-জোড়া দেখে মনে হয়, জুতোর মালিক অত্যন্ত লম্বা-চওড়া লোক। অথচ বাইরে যে দাগ দেখলুম তাতে মনে হয়, যিনি জুতো পরেছিলেন, তিনি মাঝামাঝি সাইজের লোক। দাগগুলি খুবই কাছে-কাছে।"

কুণাল বলল, "যদি অন্য কেউ ললিতের জুতো পায়ে দিয়ে গিয়ে থাকে ?"

শশাঙ্ক একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "যদি নয় কুণাল, নিশ্চয়ই অন্য লোক পায়ে দিয়েছিল!"

—"কিন্তু কে সে ? আর কেনই বা সে পায়ে দিলে ?"

আমার বিশ্বাস, শশাঙ্কের মনের মধ্যে তখন ডাক্তার ঘোষের কথা আনাগোনা করছিল। তবু সে সেকথা প্রকাশ করল না। শুধু বলল, "কুণাল, তোমার বাবাকে তুমি অবিশ্বাস করো না। আচ্ছা, এবার তুমি যেতে পার।"

কুণাল এবং রাজা-বাহাদুর দুজনেই একসঙ্গে উঠলেন। রাজা-বাহাদুর যাবার সময় জিজ্ঞাসা করলেন, "এবার কাকে ডাকবে ?"

শশাঙ্ক বলল, "কাউকেই না। আমি প্রথমে একটু ললিতের ঘরটা দেখতে চাই। ফিরে এসে ডাকব।"

তারা চলে যেতেই শশাঙ্ক বলল, "চল রামচরণ, ললিতের ঘরটা আমাদের দেখিয়ে দেবে।"

ললিতের ঘরে জিনিষপত্র বিশেষ কিছুই ছিল না। একটা মাদুর, একটা বিছানা, একটা চামড়ার সুটকেশ, একটা দড়িতে কয়েকখানা কাপড়, গোটা দুই জামা—এই-ই সব।

সুটকেশে তালা দেওয়া ছিল। শশাঙ্ক তার পকেট থেকে বড় একগোছা চাবি বার করে অল্প চেষ্টাতেই তালা খুলে ফেলল। সুটকেশের ভিতরেও বিশেষ কিছু ছিল না, শুধু কিছু জামা-কাপড়, খান-তিনেক চিঠি আর একখানা পোষ্ট-অফিসের পাশ-বই।

দুখানা চিঠি তার মার লেখা, একখানা দিদির। কোন চিঠিতেই

boiRboi.net

এমন কিছু ছিল না, যাতে তার হঠাৎ নিরুদ্দেশের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

শশাঙ্ক পাশবইখানা তুলে নিল। কয়েক পাতা উল্টেই সে বিস্মিত কণ্ঠে বলল, "মজা দেখেছো নিখিল! রাজা-বাহাদুরের কাছে শুনেছি, ললিত মাইনে পেত চল্লিশ টাকা। মাস-চারেক আগে পর্য্যন্তও ও মাসে-মাসে পাঁচ-ছ' টাকার বেশী করে জমা দিতে পারেনি। তার পরে হঠাৎ তার জমার অঙ্ক কিরকম বেড়ে গেল? এপ্রিলে একশ' টাকা, মে-তে দেড়শ', জুনে একশ', আর জুলাইএ একেবারে তিনশ'! আশ্চর্য্য নিখিল, আশ্চর্য্য!"

একটু থেমে সে আবার বলল, "এতে তোমার কি মনে হয় নিখিল? কোত্থেকে সে হঠাৎ এত টাকা পেতে আরম্ভ করল?"

আমি নিশ্চিত ভাবে বললুম, "কি করে আবার, চুরি করে!"

—"না হে না, চুরি নয়। আমার মনে হয়, কাউকে ভয় দেখিয়ে সে টাকা আদায় করত!"

—"ভয়? ললিত একজন ড্রাইভার, সে ভয় দেখাবে কাকে?"

—"হয়ত ললিত কারুর এমন কোন গোপন কথা জানে যে, তা ফাঁস হয়ে গেলে তার সমূহ বিপদ। তাই তাকে টাকা দিয়ে ললিতের মুখ বন্ধ করতে হয়েছে।"

শশাঙ্কের চোখ চিন্তায় কুটিল হয়ে উঠল, বলল, "না নিখিল, কেসটা অনেকটা সহজ হয়ে আসছে!"

—"কি করে?" আমি প্রশ্ন করলুম।

শশাঙ্ক ঘাড় নেড়ে বলল, "আর একটু ধৈর্য্য ধর, নিখিল! রামচরণ, আমরা বসবার ঘরে যাচ্ছি, তুমি ডাক্তার ঘোষকে সেখানে পাঠিয়ে দেবে।"

এগারো

শশাঙ্ক বলল, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই ডাঃ ঘোষ। আপনার কাছে হয়ত হাস্যকর মনে হবে, কিন্তু আমি কৌতূহল দমন করতে পারছি নে। ব্যাপারটা হল এই যে, কাল সন্ধ্যায় আমরা যখন এ-বাড়ীতে আসি, তখন গেটের কাছে আসতে-না-আসতেই আপনি প্রেতলোক থেকে ইঙ্গিত পেলেন যে, এই বাড়ীর সঙ্গে কি একটা অশুভ জড়িয়ে রয়েচে! তার পর নিখিল যখন খাওয়া-দাওয়ার পর বাইরে গেল, তখনও আপনি ঐ রকম একটা সঙ্কেত পেলেন। অথচ যে মণ্টুর সঙ্গে আপনার আত্মিক যোগ রয়েচে, তার মৃত্যু সম্বন্ধে কোন আশঙ্কাই আপনার মনে এলো না! এটা খুবই আশ্চর্য্য নয়?"

ডাক্তার ঘোষ অত্যন্ত নিম্নস্বরে বললেন, "আপনি কি আমাকে সন্দেহ করেন?"

—"সন্দেহের কথা আসছে না এখানে—কথা হলো ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য্যজনক মনে হচ্ছে—এই!"

তারপর একটু থেমে আবার বলল, "কাল রাতে আপনার কেমন ঘুম হয়েছিল? কোন কারণে আপনি জাগেননি একবারও?"

—"না, কাল রাতে অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলুম, একেবারে মড়ার মত ঘুমিয়েছি। জেগেছি আজ সকালে যখন নিখিলবাবু আমাকে ডাকতে গেলেন, তখন।—শশাঙ্কবাবু, আমি মনে-প্রাণে বলছি আমি একাজ করিনি, আমার নিজের স্বার্থেই আমি একাজ করতে পারিনে।"

—"মানে?"

—"দেখুন, এ-বাড়ীতে আসবার আমার একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। রাজা-বাহাদুর আমাকে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্য দু'-লাখ টাকা দিতে চেয়েছিলেন। সবাই এ-প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। একমাত্র মণ্টুবাবুই আমার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন। কলকাতায় যখন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে যান, তখনই আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি আমাকে সাহায্য করবেন। সেক্ষেত্রে তাকে—না শশাঙ্কবাবু, এ হতেই পারে না।"

আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম, কখন শশাঙ্ক তাকে ভিজে ছাতার কথা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু শশাঙ্ক সেদিক দিয়েও গেল না। সে হঠাৎ কঠিনকণ্ঠে বলল, "ডাক্তার ঘোষ, আপনাকে সব কথা খুলে বলতেই হবে। আপনার প্রেততত্ত্বের আজগুবী কথা এখন ছেড়ে দিন। কাল রাত্রে আপনি যে ভৌতিক এক্সপেরিমেণ্ট করেছেন, সেটা মোটেই ভৌতিক নয়—সবটাই আপনার এবং মণ্টুর অভিনয়।

—"অভিনয়?" ডাক্তার ঘোষ অসহ্য বিস্ময়ে প্রায় চীৎকার করে উঠলেন।

—"হ্যাঁ। অভিনয়, ফাঁকি, ধাপ্পাবাজী—যা ইচ্ছে বলতে পারেন। মণ্টু মোটেই আবিষ্ট হয়নি। দু'এক ফোঁটা বেলেডোনা দিয়ে তার চোখের তারা বড় করা হয়েছিল, যাতে মনে হয় সত্যিই সে অচেতন হয়ে গেছে—"

মুহূর্ত্তের মধ্যে ডাক্তার ঘোষের মুখ ছাইএর মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল! তিনি জড়িয়ে-জড়িয়ে বললেন, "আপনি বলতে চান—"

—"হ্যাঁ, আমি তাই চাই,—পুলিশের হাঙ্গামায় যদি নিজেকে জড়াতে না চান, তাহলে সত্যি কথা খুলে বলুন।"

পুলিশের নামে ডাক্তার ঘোষের আবার ভাবান্তর হলো। তিনি হতাশভাবে বললেন, "আপনার কথাই ঠিক। আমি আর মণ্টুবাবু পরামর্শ করেই কালকের অভিনয় করেছিলুম।"

—"সেটুকু আমি জানি; কিন্তু কেন?"

—"কারণ, মণ্টুবাবু আমাকে বলেছিলেন, তিনি সন্দেহ করেন যে রাজা-বাহাদুরের স্ত্রীকে এই বাড়ীরই কেউ হত্যা করেছেন। তাঁর ধারণা ছিল, এই ধরণের একটা অভিনয় করলে, যে দোষী সে হয়ত ভয় পেয়ে ধরা দেবে।"

—"মণ্টু কাউকে সন্দেহ করে কিনা আপনাকে কিছু বলেছিল?"

—"না—আমাকে সে সব কিছু বলেননি। বলেছিলেন যে, একথা তিনি এক ললিত ড্রাইভার ছাড়া আর কাউকে বলেননি।"

—"আপনারা কোথায় বসে এই পরীক্ষার রিহার্সাল দিতেন?"

—"কলকাতায়—তখন রাজা-বাহাদুর অসুস্থ। মণ্টুবাবু চার-পাঁচদিন রোজ সন্ধ্যেবেলা আমার কাছে যেতেন। শশাঙ্কবাবু, আমি বিশ্বাস করেছিলাম যে, আমি সৎ-উদ্দেশ্যেই এই ফাঁকির কাজ করছি।"

মাথা নাড়তে-নাড়তে শশাঙ্ক বলল, "আপনার সৎ-উদ্দেশ্যের সমূহ ফল তো এই হলো যে একটি নির্দ্দোষ ছেলে প্রাণ দিলে! আচ্ছা ডাক্তার ঘোষ, আপনি এখন যেতে পারেন। ধরণীবাবু এবং রজনীবাবুকে পাঠিয়ে দেবেন।"

ডাক্তার ঘোষ নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন।

boiboi.net

বারো

ডাক্তার ঘোষ বেরিয়ে যেতেই আমি ফেটে পড়লুম, "তুমি যে ডাক্তার-সাহেবের ভিজে ছাতার কথা তুললেই না ?"

শশাঙ্ক হেসে বলল, "অত ব্যস্ত হয়ো না নিখিল ! দড়ি ছেড়ে দিচ্ছি। আমি দেখতে চাই ডাক্তার ঘোষের দৌড় কতখানি !"

—"কিন্তু তিনি যে বলেছেন সারারাত অঘোরে ঘুমিয়েছেন, সেও তাহা মিথ্যা কথা !"

—"নিশ্চয়ই ! শুধু তাই নয় নিখিল, আরও অনেক মিথ্যার জন্য তাঁকে এক সময় জবাবদিহি করতে হবে।"

এমন সময় ধরণীবাবু এবং তাঁর ভাই ঘরে ঢুকলেন।

শশাঙ্ক প্রথমে ধরণীবাবুকে প্রশ্ন করল, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। কাল বা তার আগে কখনও মণ্টু আপনাকে তার কোন বিপদের আভাস দিয়েছিল ?"

—"না। মণ্টু আমার চাইতে বয়সে অনেক ছোট ছিল। আমার সঙ্গে সে খুবই কম কথা বলত।"

—"কেন ?"

—"বোধ হয় সমীহ করত।"

—"আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন, আর কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই।"

শশাঙ্ক এবার রজনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, "কাল আপনি কত রাত্রে এ-বাড়ীতে ফিরেছেন ?"

রজনীবাবু বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বললেন, "কাল নয়, ফিরেছি

আজ সকালে। আমি দাদার—মানে ধরণীবাবুর ঘরে ঢুকেই দেখি এই ব্যাপার ! আপনারা সবাই তখন সেখানে ছিলেন।"

—"আপনি আসছিলেন কোথা থেকে ?"

—"আসছিলুম ঢাকা সহর থেকে।"

—"কখন রওনা হয়েছিলেন ?"

—"রাত সাড়ে চারটেয়।"

শশাঙ্ক ফের বলল, "তাহলে আপনি ভোর সাড়ে চারটেয় ঢাকা ছেড়েছেন ?"

—"নিশ্চয়ই ! কথাটা বার-বার জিজ্ঞাসা করছেন কেন বলুন ত ?"

—"কথাটা মিথ্যে বলেই।" শশাঙ্ক স্থিরভাবে বলল।

রজনীবাবুর মুখে-চোখে রাগের লক্ষণ দেখা দিল ; তিনি বললেন, "মিথ্যে মনে হলো কেন আপনার ?"

শশাঙ্ক এবার দৃঢ়স্বরে বলল, "দেখুন রজনীবাবু, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমার সময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কাল আপনি এসেচেন অনেক রাত্রে। গাড়ী রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে একবার বাড়ীর ভিতরেও এসেছিলেন। তারপর আবার তক্ষুনি ফিরে যান গাড়ীতে। অনেকক্ষন পরে আবার বাড়ীর মধ্যে এসেছেন। এই দ্বিতীয়বার এসেচেন পাঁচটায়। এখন বলুন, কেন আপনি আর একবার এসেই চলে গিয়েছিলেন ?"

ঘরের মধ্যে হঠাৎ বাজ পড়লেও রজনীবাবু বোধহয় এত চমকে উঠতেন না। অসহ্য বিস্ময়ে অনেকক্ষণ তিনি কোন কথাই কইতে পারলেন না। এমন সময় রামচরণ খবর দিল, রমেশ ডাক্তারকে নিয়ে পুলিশ আসচে।

পুলিশের নাম শুনে রজনীবাবুর খেয়াল হলো। তিনি যেন অনেকটা মরিয়া হয়েই বললেন, "হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক। আমি এসেছিলুম রাত তিনটেয়। ঘরে এসে একটু পরেই আমি বুঝতে পারি যে মণ্টু মৃত। তখন আমার ভয় হলো ; ভাবলুম, আবার কি ফ্যাসাদে পড়ি! তাই ঠিক করলুম, লোক জাগা পর্য্যন্ত গাড়ীতেই অপেক্ষা করব।"

—"মণ্টুকে মৃত দেখে আপনার ভয় হলো কেন?"

শশাঙ্ক 'ভয়' কথাটার উপর খুব জোর দিল।

—"সে অনেক কথা শশাঙ্কবাবু! সংক্ষেপে আপনাকে বলছি। কুণাল চলে যাবার মাস-চারেক পরে রাজা-বাহাদুর ঠিক করেন যে, মণ্টুকে দত্তক নেবেন। কবে নেবেন তা অবশ্য তখন কিছুই ঠিক করেননি। তখন তিনি এক উইল করেন। তাতে তাঁর সম্পত্তির চার আনা আমাদের দু'ভাইকে দেন। বাকী দশ আনা মণ্টুর, আর দু'আনা সমরের। মণ্টু যদি মারা যায়, তবে সে সম্পত্তি সমান তিনভাগে দাদা, আমি এবং সমরের মধ্যে ভাগ হবে ; কিন্তু এর মধ্যে কুণাল যদি এসে পড়ে, তবে মণ্টুর দশ আনার অর্দ্ধেক সে পাবে।

মণ্টু মারা গেলে তাই সন্দেহ হয়ত আমার উপরেও পড়তে পারে।"

এমন সময় পুলিশের আবির্ভাব হল। রাজা-বাহাদুরই সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রাথমিক পরিচয়ের পরে ইন্সপেক্টর বিজয়বাবু বললেন, "আমার একটু দেরী হয়ে গেল। তবে ভরসা ছিল, আপনি ঘটনাস্থলে আছেন! আপনি যদি এই তদন্তে আমাকে সাহায্য

করেন, তাহলে বড়ই বাধিত হব। আমি আপনাকে একান্তে একটা কথা বলতে চাই—"

শশাঙ্ক বলল, "আমার সাহায্য চাইলেই পাবেন বিজয়বাবু!"

তারপর আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, "এ আমার বন্ধু নিখিল, এর কাছে আমার কিছুই গোপন নেই।"

বিজয়বাবু আমাদের একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন, "আমি আপনার সিমেণ্টের খোঁজ নিয়েছিলাম। লালগড়ে একটিমাত্র সিমেণ্টের দোকান আছে। তারা বলেন, ১৯৩৪ সালের অক্টোবরে তারা এক বস্তা সিমেণ্ট এখানে দিয়েছিল। তারা বললে, বাইশে রাত্রিতে রাজবাড়ীর একজন চাকর গিয়ে তাদের একটা চিঠি দেয়। তাতে লেখা ছিল যে, পরের দিন ভোর বেলাই রাজবাড়ীর দরজায় যেন এক বস্তা সিমেণ্ট রেখে দিয়ে আসা হয়। তাতে স্পষ্ট করে লেখা ছিল যে, যে ডেলিভারি দেবে, সে যেন রাজবাড়ীর কাউকে না ডাকে—শুধু বস্তাটি গেটের কাছে রেখেই যেন চলে যায়। ঘটনাটা খুবই অদ্ভুত ধরণের, তাই দোকানদারের মনে আছে। দ্বিতীয়তঃ, এখন পর্য্যন্ত রাজা-বাহাদুরের ড্রাইভার বা তাঁর গাড়ীর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।"

শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করল, "আপনি সঙ্গে ক'জন কনষ্টেবল নিয়ে এসেচেন?"

—"পাঁচজন।"

—"তাদের তিনজনকে আমি একটা কাজে পাঠাতে চাই। কাল রাতে এই বাড়ীর গেটের কাছে একটা লোক লুকিয়েছিল। নিখিল তার খোঁজ করতে গিয়ে তার হাতের বিরাশি-সিক্কা একটি ঘুষি খেয়ে

ফিরে আসে। নিখিল আপনার কনষ্টেবলদের কাছে তার যথাসম্ভব বর্ণনা দেবে। লোকটা মনে হয়, এই বাড়ীর বাইরেই ঝোপেঝাড়ে কোথাও লুকিয়ে আছে। তাকে খুঁজে বার করতে হবে। তারপর তাকে পাওয়া গেলে, রমেশবাবুর ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে আমাকে সংবাদ দিতে বলবেন, এখানে আনবেন না।"

বিজয়বাবু রাজী হলেন। তিনি কনষ্টেবলদের ডাকতে পাঠালেন।

শশাঙ্ক ইতিমধ্যে রমেশবাবুকে বলল, "কাল সন্ধ্যাবেলায় সমর আপনার কাছে গিয়েছিল?"

—"হ্যাঁ। ও বলছিল ওর ক'দিন ধরে রাত্রে ঘুম হয় না। তাই ওকে কয়েকটা এ্যাসপ্রো ট্যাবলেট দিয়েছিলাম।"

—"আপনি কাল বা পরশু কাউকে ক্লোরোফর্ম বিক্রি করেছেন?"

রমেশবাবু শশাঙ্কের কথায় একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, "আপনার কথায় আমার একটা অদ্ভুত ব্যাপার মনে পড়চে। আমার ডাক্তার-খানায় এক শিশি ক্লোরোফর্ম ছিল; রাজবাড়ীর পিসীমা তাঁর দাঁতের জন্য মাঝে-মাঝে আনাতেন। কাল আমি একবার ক্লোরো-ফর্মের শিশিটার খোঁজ করেছিলুম। কিন্তু আশ্চর্য্য, সেটি চুরি গেছে!"

—"আপনি কখন খোঁজ করেছিলেন?"

—"সন্ধ্যার সময়।"

—"সমর আপনার কাছে যাবার আগে না পরে?"

রমেশবাবু খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "আমার ঠিক স্মরণ নেই। তবে যতদূর মনে হয়, সমর চলে যাবার পরে।"

শশাঙ্ক শুধু বলল, "হুঁ।"

একটু পরে বলল, "চলুন, আপনারা মৃতদেহ দেখবেন। পোষ্ট-মর্টেমের বন্দোবস্তও তো আপনাকেই করতে হবে বিজয়বাবু!"

রাজা-বাহাদুর, বিজয়বাবু এবং রমেশবাবু বেরিয়ে গেলেন। আমি আর গেলুম না। কনষ্টেবলরা এলে তাদের কাল রাতের লোকটার বর্ণনা দিলুম। ওরা চলে গেলে ভাবলুম, কলকাতায় লালবাজারে একটা ট্রাঙ্ক-কল্ করি—ডাক্তার ঘোষের অতীত ইতিহাস জানবার জন্য।

ডাকলুম লালবাজারকে।

—"হ্যালো! কে? কি বললেন? চীফ্ ইন্সপেক্টর? আমি নিখিল বক্সী, লালগড় রাজবাড়ী থেকে বলচি।"

—"হ্যাঁ, বলুন।" দূর থেকে উত্তর এল।

—"প্রেততত্ত্ববিদ ডাক্তার ঘোষের নাম শুনেছেন? কালিম্পংএ থাকেন যিনি?"

—"হ্যাঁ; কিন্তু কেন বলুন দেখি?"

—"তাঁর অতীত ইতিহাস—"

ইন্সপেক্টর আমাকে শেষ করতে না দিয়েই বললেন, "ব্যাপার কি নিখিলবাবু? কাল রাত্রে শশাঙ্কবাবুও ঠিক এই কথাই বলছিলেন লালগড় রাজবাড়ী থেকেই। তাঁর কাছেই কাল শুনলুম, আপনিও ওখানেই আছেন। আজ আবার আপনি ঐ এক কথাই জিজ্ঞেস করছেন! যাহোক, খবর পেলেই আপনাদের জানাব।"

বিস্মিত হয়ে টেলিফোনটা রেখে দিলুম।

তেরো

খানিকক্ষণ পরেই শশাঙ্ক ফিরে এলো; বলল, "বিজয়বাবু আর ডাক্তারবাবু মণ্টুর মৃতদেহ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। মৃতদেহ ঢাকায় পাঠাতে হবে পোস্ট-মর্টেমের জন্য। আইনের টেক্‌নিক্যালিটি কিনা, এড়াবার উপায় নেই। আমরা চল ততক্ষণ রাজা-বাহাদুরের বাগানে একটু বেড়িয়ে আসি। মস্তবড় বাগান—প্রায় সত্তর বিঘে জমির উপর।"

যেতে-যেতে মণ্টুর হত্যার কাহিনীই আলোচনা হতে লাগল। আমি বললুম, "সমস্ত ব্যাপারটাই অবশ্য খুবই রহস্যময়। তাহলেও আমার মনে হয়, ডাক্তার ঘোষই অপরাধী।"

—"কেমন করে?" শশাঙ্ক বলল।

—"নয় কেন?"

—"প্রথমেই দেখ, ডাক্তার ঘোষের মণ্টুকে হত্যা করায় কোন স্বার্থ নেই। তিনি নিজেই বলেচেন, যখন রাজবাড়ীর সবাই তাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন, তখন একমাত্র মণ্টুই তাঁর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। সেক্ষেত্রে তাকে খুন করা ডাক্তার ঘোষের পক্ষে অসম্ভব।"

আমি একটুকাল চুপ করে থেকে বললুম, "আচ্ছা, ধরণীবাবুকে আমরা বাদ দিতে পারি।"

—"কি করে?"

—"মণ্টুকে সরিয়ে ফেলতে পারলে তাঁর কি স্বার্থ?"

—"তাঁর স্বার্থ, মণ্টুর অংশের অর্থের কিছুটা তিনি পাবেন।"

—"সেদিক দিয়ে বিচার করলে তো রজনীবাবুকেও দোষী ধরা যায়?"

—"যায়ই তো!" শশাঙ্ক সংক্ষেপে বলল।

—"ভারী গোলমেলে কেস্ শশাঙ্ক! কখনও মনে হয় কুণালই হয়ত একাজ করেছে—মণ্টু মারা গেলে তার তো সমূহ স্বার্থ আছে। সব সম্পত্তিই সে পাবে।"

শশাঙ্ক হেসে বলল, "তুমি একে-একে সবাইকেই দোষী ভাবচ! তাহলে আর রাজা-বাহাদুরকেই বা বাদ দিচ্ছ কেন?"

আমি বিস্মিত হয়ে বললুম, "রাজা-বাহাদুরের পক্ষে এ-কাজ অসম্ভব।"

—"অসম্ভব বলে কিছুই নেই পৃথিবীতে, নিখিল! হয়ত কুণাল ফিরে আসতে রাজা-বাহাদুরের মনে একটা ধিক্কার এসেছে—কেন তিনি আরও অপেক্ষা করলেন না, কেন তিনি তাড়াতাড়ি মণ্টুকে পোষ্য নিয়ে কুণালকে অনেকখানি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন! কে জানে, তিনিই অনুশোচনার বশে মণ্টুকে হত্যা করেছেন কিনা?"

—"না শশাঙ্ক, আমার মাথায় এ-সব একেবারেই ঢুকছে না। কখনও আবার মনে হয়, পিসীমা বা সমরই এই কাজ করেছে। মণ্টু মারা গেলে তাদেরও তো স্বার্থ আছে! তাছাড়া রমেশবাবু বলেছেন যে তাঁর যতদূর মনে হয়, সমর তাঁর ডাক্তারখানা থেকে চলে যাবার পরেই ক্লোরোফর্মের শিশি পাওয়া যায়নি। সত্যিই যদি সে এনে থাকে? না শশাঙ্ক, এ রহস্য ভেদ করা আমার সাধ্য নয়! আচ্ছা, তুমি কাকে সন্দেহ কর?"

শশাঙ্ক আমার কথার উত্তর না দিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "ওই

চেয়ে দেখ নিখিল!" বলে দূরে একটা ঝোপের দিকে আঙুল্ দিয়ে দেখিয়ে দিল। আমি সেই দিকে তাকিয়ে দেখি, ঝোপের পিছনেই একখানা মোটর গাড়ী।

শশাঙ্ক বলল, "এ-গাড়ী আমি চিনি। এই-ই রাজা-বাহাদুরের হারানো গাড়ী। চল যাই, গাড়ীখানা ভাল করে দেখা যাক্।"

দুজনে দৌড়ে গাড়ীর কাছে গেলুম। গাড়ীর সব দরজা-জানলা খোলা—ভিতরে কেউ নেই।

শশাঙ্ক চারদিকের জমিটা পরীক্ষা করে বলল, "কাল সন্ধ্যায় বৃষ্টির আগে থেকেই গাড়ীটা এখানে আছে। মাটির উপরে গাড়ীর চাকার সামান্য দাগ আছে, কিন্তু কারুর পায়ের দাগ নেই। ললিত নিশ্চয়ই বৃষ্টির আগেই এখান থেকে গেছে—পরে গেলে কাদার উপর তার পায়ের ছাপ থাকত।"

আমি বললুম, "গাড়ীর দরজা-জানলাগুলি সব খোলা কেন?"

—"উদ্দেশ্য তো পরিষ্কার—ক্লোরোফর্মের গন্ধ উড়িয়ে দেবার জন্য।"

সত্যিই কথাটা আমার মনেই হয়নি! এখানেও তাহলে ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু কার উপরে? ললিতই বা গেল কোথায়?

শশাঙ্ক গাড়ীর ভিতরে পরীক্ষা করতে-করতে একটা হাতুড়ী বার করে বলল, "খুন করবার ছোট একটি অস্ত্র—কিন্তু বেশ উপযোগী, নয়?" বলে সে আমার দিকে তাকাল।

তারপর আবার বলল, "আততায়ী নিশ্চয়ই ড্রাইভারের পিছনের দিকে লুকিয়ে ছিল, তারপর তাকে হঠাৎ হাতুড়ী মেরে অচেতন করে

ফেলে, শেষে ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করেচে। এই দেখ, ড্রাইভারের কোট আর টুপিও এখানে পড়ে রয়েছে।" বলে শশাঙ্ক টুপিটা তুলে নিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করতে লাগল।

একবার নাকের কাছে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গন্ধ শুঁকে বলল, "গাড়ীর দরজা খোলা ছিল, তাই টুপি আর কোট সব ভিজে গেছে—তবু টুপি থেকে জবাকুসুম তেলের সামান্য গন্ধ আসচে। নিখিল, কেস্‌টা এবার আমার কাছে একটু-একটু করে পরিষ্কার হয়ে আসছে।"

তারপর সে হঠাৎ গাড়ীর বাইরে এসে চাকার তলায় হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ঝুঁকে পড়ে কি দেখতে লাগল। একটু পরেই টায়ার থেকে লাল-নীল রংএর কয়েক কুচি ছোট পাথর বার করে নিয়ে এলো।

—"এগুলি কি জন্যে বার করলে?"

—"একটু পরেই জানতে পারবে নিখিল! শয়তান ললিতকেও খুন করেছে। এক্ষুণি আমাকে একবার রাজা-বাহাদুরের কাছে যেতে হবে।"

রাজবাড়ীতে পৌঁছে দেখি, বিজয়বাবু সমরকে জেরা করছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, "আপনি ডাক্তারখানা থেকে ক্লোরোফর্মের শিশি এনেছেন?"

সমর দৃঢ়স্বরে বলল, "আমি ক্লোরোফর্মের কথা কিছুই জানিনে।"

শশাঙ্ক বলল, "সে প্রশ্ন সমরকে আমি আগেই করেছিলুম, বিজয়বাবু! আমার যতদূর মনে হয়, সমর সত্য কথাই বলেছে। আপনাকে একটা সুখবর দিচ্ছি বিজয়বাবু, রাজা-বাহাদুরের গাড়ীখানা পাওয়া গেছে।"

বিজয়বাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, "কোথায়?"

—"রাজা-বাহাদুরের বাগানে।"

—"আশ্চর্য্য তো!" বিজয়বাবু বললেন।

—"মোটেই আশ্চর্য্য নয়—এইটেই স্বাভাবিক। গাড়ী যে লোকই সেখানে নিয়ে গিয়ে থাক্, সে নিশ্চয়ই বুঝেছিল যে পুলিশ সব জায়গাতেই গাড়ীর খোঁজ করবে; কিন্তু রাজা-বাহাদুরের বাগানে যে গাড়ী থাকতে পারে, এ-কল্পনা পুলিশের মাথায় আসবে না।"

বিজয়বাবু একটু আহত হলেন যেন! তিনি বললেন, "আপনি আমাদের মোটাবুদ্ধি বলচেন?"

—"মোটেই না! খুব তলিয়ে না দেখলে সব লোকেই এই সিদ্ধান্ত করবে। সে যাক্, বলতে পারেন এখানে কাছাকাছি কারুর বাড়ীতে লাল-নীল পাথরের কুচি-বিছানো রাস্তা আছে?"

—"পাথরের কুচি-বিছানো রাস্তা দিয়ে আবার কি হবে?" বিজয়বাবু বিস্মিতকণ্ঠে বললেন।

—"ওইরকম রাস্তা কোথাও আছে কিনা আগে বলুন।"

বিজয়বাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, "না, আমার তো মনে পড়ে না।"

রাজবাড়ীর সবাইকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলো। কুণাল বলল, "আমার মনে পড়েচে। এখান থেকে মাইল খানেক দূরে হালদারদের যে বাগানবাড়ী আছে, সেখানকার রাস্তায় লাল-নীল পাথর বসানো আছে। তা সে বাড়ী তো এখন পোড়ো বাড়ীর মত। কেউ থাকে না। একটি মালি পর্য্যন্ত নেই।"

শশাঙ্ক বলল, "চলুন বিজয়বাবু, সেখানে যাওয়া যাক্। ওইখানেই আমরা ললিতের মৃতদেহ দেখতে পাব আশা করি।"

বিজয়বাবুর বিস্ময় আর বাধা মানল না; বললেন, "কেমন করে আপনি এই সিদ্ধান্ত করলেন?"

—"সেকথা পরে বুঝিয়ে বলব—আগে চলুন তো সেখানে।"

এমন সময় হঠাৎ একটা তীব্র আর্ত্তনাদ শোনা গেল। কে যেন তীক্ষ্ণকণ্ঠে "মা—মাগো" বলে চীৎকার করে উঠলো!

আর্ত্তনাদটা এতই আকস্মিক এবং করুণ যে, আমরা সবাই মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলুম। একটু পরেই দেখি, পিসীমা হন্তদন্ত হয়ে নীচের দিকে ছুটে যাচ্ছেন, পিছনে-পিছনে রাজা-বাহাদুর।"

বিজয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "শুনতে পেলেন শশাঙ্কবাবু?"

শশাঙ্ক প্রশ্ন করল বোধহয় সমরকেই, "কে অমন করে চীৎকার করে উঠল?"

সমর বলল, "কুণালদা—শশাঙ্কবাবু, শব্দটা আসছে নীচের তলার গুদাম-ঘরের দিক থেকেই।"

শশাঙ্ক আর দেরী না করে ছুটল গুদাম-ঘরের দিকে। আমরাও অনুগমন করলুম। গুদাম-ঘরে এসে দেখি, রাজা-বাহাদুর এবং পিসীমা সেখানে আগেই এসে পৌঁছেচেন। ঘরের সব জানলা বন্ধ, একটা ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে। চারিদিকে ভাঙ্গাচোরা বাক্সপত্র ইতস্ততঃ ছড়ানো। ঘরের মধ্যে এক জায়গায় মেজের উপরে এক বিরাট গর্ত্ত, পাশে একটা শাবল পড়ে আছে। গর্ত্তের মধ্যে ধুলো-কাদা মাখা কুণাল দাঁড়িয়ে। আমাদের দেখে সে বলে উঠল, "আপনারা এসেছেন? তবে দেখুন!"

এই বলে সে গর্ত্তের মধ্য থেকে অতি সন্তর্পণে এবং যত্নের সঙ্গে কতকগুলি হাড় হাতে করে তুলে বলল, "শশাঙ্কবাবু, এই—এই আমার মায়ের কঙ্কাল!"

কুণাল আর কিছু বলতে পারলো না, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

boiboi.net

প্রবল বিস্ময়ে এবং আকস্মিক বেদনায় আমরা সবাই কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম; কিন্তু শশাঙ্ক তার কর্তব্য ভোলেনি। সে দৃঢ়পদে এগিয়ে এসে দু'হাত দিয়ে পাঁজাকোলা করে কুণালকে গর্তের ভিতর থেকে টেনে তুলল। কুণাল একবার পরম ভক্তিভরে সেই হাড়গুলিই বুকে চেপে ধরল। তারপর সযত্নে সেগুলি শশাঙ্কের হাতে তুলে দিল।

ঘটনার এই রকম চাঞ্চল্যকর পরিণতি দেখে রাজা-বাহাদুর যেন ব্যথায় নীল হয়ে গেলেন! তাঁর ঠোঁট দুটি অব্যক্ত যন্ত্রণায় থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগল। তিনি ছেলের মুখের দিকে তাকাতে পারছিলেন না।

কুণাল কম্পিতপদে অগ্রসর হচ্ছিল, হঠাৎ রাজা-বাহাদুরের সামনে এসে একবার একটু থমকে দাঁড়াল; তারপর তাঁর বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

অবশেষে বিজয়বাবু বললেন, "এই আবিষ্কারে আমাদের কাজ আরও জটিল হলো!"

শশাঙ্ক ধীরস্বরে বলল, "না, আমাদের কাজ আরও সহজ হলো।"

—"কেমন করে?" বিজয়বাবু বললেন।

—"পরে বলব সে কথা। আগে আপনি এই অস্থিগুলি ঢাকায় পাঠাবার বন্দোবস্ত করুন। আর পিসীমা, আপনি কুণালকে আপনার ঘরে নিয়ে যান। ওকে একটু শান্ত করতে পারেন কিনা দেখুন! আমরা ততক্ষণ একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসছি।"

শশাঙ্কের অনুরোধে আমি এবং বিজয়বাবু ছাড়া আর সবাই বেরিয়ে গেল। সবাই চলে যেতেই শশাঙ্ক লাফ দিয়ে গর্তের

মধ্যে পড়ে হাতড়ে-হাতড়ে কি যেন খুঁজতে লাগল। কয়েক-মিনিট পরেই শশাঙ্ক উঠে এলো—তার হাতে ছোট একটা টিন—মরচে-ধরা, তবু তার উপর অস্পষ্টভাবে খোদাই করা 'ক্লোরোফর্ম-ডি-কলোন'।

শশাঙ্ক উত্তেজিত হয়ে বলল, "সেই একই ধরণের অপরাধ নিখিল! কুণালের মা, মণ্টু, ললিত—সবাইকেই ক্লোরোফর্ম এর সাহায্যে হত্যা করা হয়েছে। বিজয়বাবু, আপনি রাজবাড়ীর চারিদিকে পাহারা বসান; একটি প্রাণীও যেন বাইরে না পালাতে পারে।" তারপর একটু থেমে অনেকটা নিজের মনেই বলল, "বদমায়েস্, শয়তান কোথাকার!"

চৌদ্দ

শশাঙ্ক আশপাশেই কোথাও বেরিয়েছিল। ফিরে আসতে রাজা-বাহাদুর তাকে বললেন, তার নামে লালবাজার থেকে একটা ট্রাঙ্ক-কল এসেছিল। শশাঙ্ক তাই শুনে টেলিফোন তুলে নিয়ে, লালবাজারের একটা বিশেষ বিভাগকে ডাকল।

শশাঙ্ক ডাকল, "হ্যালো! চীফ্ অব্ আরকাইভ্স্? আমি শশাঙ্ক, কথা বলছি।"

boiboi.net
boiboi.net

ওপাশের কথা আমি শুনতে পেলুম না। একটু পরেই শশাঙ্ক একহাতে ফোন ধরে অন্য হাতে তার নোট-বই-এর এক পাতায় লিখতে লাগল—

ডাক্তার বঙ্কুবিহারী ঘোষ—প্রেততত্ত্ববিদ্

উচ্চতা—৫ ফুট ৪ ইঞ্চি

ওজন—১ মণ ১৮ সের

বয়স—৫১

চুল—একটু লালচে

চোখ—ঈষৎ কটা

মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আছে। মাড়ির দুটো দাঁত সোনা-বাঁধানো। পাঁচ-ছটা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। প্রায় সর্ব্বদাই কালিম্পং-এ থাকেন। অত্যন্ত নিঃসঙ্গ জীবন।—সঙ্গী সেক্রেটারী যতীন বোস, আর এক চাকর ভোলা। বহু বই লিখেছেন, বিশ বৎসর যাবৎ প্রেততত্ত্ব আলোচনা করছেন। বর্ত্তমানে লালগড়েই আছেন রাজা দর্পনারায়ণের অতিথি হয়ে।

শশাঙ্ক ফোন ছেড়ে দিল। নোট-বইখানার লেখার দিকে আর একবার তাকিয়ে বলল, "আশ্চর্য্য! এর ভিতর এমন কিছু নেই যাতে ডাক্তার ঘোষের সম্বন্ধে সন্দেহ হতে পারে। ডাক্তার প্রায় বিশ বছর যাবৎ প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করছেন; অথচ তাঁর কথাবার্ত্তা শুনে মনে হয় না যে, তাঁর ও-বিষয়ে পাণ্ডিত্য খুব গভীর।"

একটু পরে হঠাৎ সে বলল, "তাইত নিখিল, এই ডাক্তার সাহেবের দুটো সোনা-বাঁধানো দাঁত আছে তো?"

আমি হেসে বললুম, "আছে কিনা দেখবে কি করে? বলবে হাঁ করুন, আপনার দাঁত দেখব! যদি না দেখাতে চায়?"

শশাঙ্ক বলল, "তুমি ব্যাপারটাকে যতটা শক্ত মনে করছ আমি ঠিক ততটা সোজা মনে করছি। তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছ যে, ডাক্তার ঘোষ চুমুক দিয়ে জল খান না—আলগোছে খান। সুতরাং তিনি যখন জল খাবেন, সেই সময় তার মুখের দিকে চাইলে তাঁর সব দাঁতগুলোই দেখা যাবে। কেমন, তাই নয়?"

কিঞ্চিৎ লজ্জা অনুভব করলাম। সত্যি, ব্যাপারটা যে এত সোজা সেটা আমার খেয়াল হয়নি।

বৈকালিক জলযোগের সময় আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম, কখন ডাক্তার ঘোষ জলপান করবেন। আমি ক্রমশই অধীর হয়ে উঠ্‌ছিলাম। আমার অধীরতা টের পেয়ে শশাঙ্ক ইসারায় আমাকে সংযত হতে বলল। সত্যি, শশাঙ্কের সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে আমি সময় সময় বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি এবং বলতে লজ্জা নেই যে, এতদিন যাবৎ শশাঙ্কের সঙ্গে মিশছি, তবু আজও ওর নাগাল পাইনি।

ক্রমশ সময় ঘনিয়ে এলো। লুচি, হালুয়া আর সন্দেশ দুটো উদরস্থ করে বিরাট হাঁ করে ডাঃ ঘোষ গলায় জল ঢালতে লাগলেন।

আড়চোখে চাইলাম। না, তাঁর মুখে সোনা-বাঁধানো দাঁতের চিহ্নমাত্র নেই!

আমি যদি শশাঙ্ক হতুম, তাহলে তখুনি ডাক্তার ঘোষকে গ্রেপ্তার

করতুম। কিন্তু শশাঙ্ক সেরকম কিছুই করল না, উপরন্তু বেশ হাসি-খুসি মনোভাব নিয়ে তাঁর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। কথায় কথায় এক সময় বলল, "আজ রাত্রে আপনাকে আর একবার প্রেতাত্মা আনাতে হবে। তবে এবারে মিডিয়াম হব আমি।"

ডাক্তারের মুখের ভাব দেখে বোঝা গেল না তিনি প্রস্তাবটাকে খুসি মনে গ্রহণ করলেন কিনা! প্রায় দু' তিন মিনিট চুপ করে থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আচ্ছা, আমি রাজী।"

—"অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার ঘোষ!"

পরে একসময় শশাঙ্ককে নির্জ্জনে পেয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "এবার কি খেলা আরম্ভ করলে শশাঙ্ক?"

—"খেলা নয়—অভিনয় বলো এবং অভিনয়ের শেষ অঙ্ক আজ রাতে অভিনীত হবে।"

প্রথমতঃ তুমি ডাক্তার ঘোষকে জাল লোক জেনেও কিছু বললে না। তাছাড়া, তাঁর সব ভৌতিক ক্রিয়া কলাপ সব জুয়াচুরি বলে বিশ্বাস করেও তাঁকে আবার পরীক্ষা করতে অনুরোধ করলে! আমি তো এ-সবের কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছিনে শশাঙ্ক!"

শশাঙ্ক হেসে বলল, "সবই বুঝতে পারবে। যদি লোকটাকে এখনই ধরতুম তাহলে ওকি আর রাত্রে ভৌতিক পরীক্ষা দেখাতে রাজি হত? তা হত না। অথচ রাতের বেলা আমি ঐ রকম একটি বুজরুকি অভিনয় করাতে চাই—কেন? তার কারণ তখনই বুঝতে পারবে।"

তারপর একটু থেমে বলল, "এসো, এবার খাওয়া-দাওয়া করা যাক। খালি পেটে কাজ এগোয় না।"

—"সে কথা একশ' বার।" আমি হেসে বললুম।

খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করছি এমন সময় বিজয়বাবু এসে হাজির। তিনি বললেন, "একটা খবর আছে!"

শশাঙ্ক বলল, "বসুন।" তারপর ডাক্তার ঘোষের ব্যাপার সে খুলে বলল।

বিজয়বাবু তো তক্ষুণি তাঁকে গ্রেফ্‌তার করতে চান! কিন্তু শশাঙ্ক বলল, "অত ব্যস্ত হবেন না বিজয়বাবু! ডাক্তার তো আমাদের হাতের মধ্যেই। আজ রাতে তিনি আবার কালকের মত প্রেত আনাবেন। এবারে আমি হব মিডিয়াম্। আপনি রাত আটটার সময় অনুগ্রহ করে দুজন কনষ্টেবল নিয়ে আসবেন। হ্যাঁ, তারপর আপনার মস্ত খবর কি বলুন!"

বিজয়বাবু বললেন, "কাল রাত্রে যে লোকটা গেটের কাছে ছিল বলছিলেন, সে লোকটা ধরা পড়েছে। বাগানের পিছনে একটা গাছের উপরে ব্যাটা লুকিয়ে ছিল। ওকে ধরে রমেশবাবুর ডাক্তার-খানায় রাখা হয়েছে। এখন আপনারা চলুন।"

ডাক্তারখানায় গিয়ে দেখি, একটা কনষ্টেবল লোকটাকে পাহারা দিচ্ছে আর সে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে। লোকটার পোষাক-পরিচ্ছদ চাকর শ্রেণীর।

শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করল, "তোমার নাম কি?"

লোকটা মাথা তুলে একবার তাকাল। কিন্তু পুলিশের পাল্লায় পড়লে সাধারণ লোকের যেমন একটা ভয় হয়, এর মুখে সে রকম কোন ভয়ের চিহ্নই দেখলুম না! বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলল, "আজ্ঞে আমার নাম ভোলানাথ দাস।"

—"কাল রাতে রাজা-বাহাদুরের বাড়ীর গেটের কাছে গাছে চড়েছিলে কেন?"

লোকটা চুপ করে রইল, কোন জবাব দিল না।

বিজয়বাবু মেঝেতে পা ঠুকে বললেন, "হারামজাদা ব্যাটা, বলবিনে কেন ছিলি ওখানে?"

লোকটার মুখে ভয়ের একটু ভাব দেখা দিলেও সে জিদ ছাড়ল না, বলল, "আমি কি দোষ করলুম বাবু যে আমার উপর জুলুম করছেন?"

এবার বিজয়বাবুর পুলিশী মেজাজ চাড়া দিয়ে উঠল। তিনি চীৎকার করে উঠলেন, "হারামজাদা, সে কৈফিয়ৎ দেবো তোর কাছে?"

তারপর কনষ্টেবলটার দিকে ফিরে বললেন, "রঘুদয়াল! ব্যাটাকে কান ধরে পঞ্চাশবার ওঠ-বস করা তো! দেখি শূয়ার-কা-বাচ্চার কতখানি তেজ!"

শাস্তি আরম্ভ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই লোকটা বুঝল যে শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছে। তাই এবারে হাত জোড় করে বলল, "ছেড়ে দিন বাবু, সব বলচি।"

বিজয়বাবু বললেন, "এই যে পথে এসেচিস!" তারপর শশাঙ্কের দিকে ফিরে বললেন, "এবারে জিজ্ঞাসা করুন আপনার যা ইচ্ছে।"

শশাঙ্ক বলল, "কাল রাত্রে ওখানে এসেছিলে কেন?—আচ্ছা আরও খুলে বলছি, ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে তোমার কাল দেখা হয়েছে?"

লোকটা দেখল, শশাঙ্ক অনেকটা জানে; তাই বলল, "না বাবু, দেখা হয় নি!"

—"কিন্তু ডাক্তার ঘোষ লোকটি কে?"

—"কেন তিনি আমাদের ডাক্তারবাবু!"

বিজয়বাবু ফের ধমক দিয়ে উঠলেন, "ফের মিছে কথা বলছিস্! ওরে রঘুদয়াল—"

লোকটা শশব্যস্তে বলল, "আচ্ছা বলছি বাবু, উনি আমাদের ডাক্তারবাবুর সেক্রেটারী যতীনবাবু।"

—"তুমি কে?" শশাঙ্ক প্রশ্ন করল।

—"আমি ডাক্তারবাবুর চাকর ভোলা।"

—"ডাক্তারবাবু কোথায়?"

লোকটা হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বলল, "ডাক্তারবাবু মারা গেছেন।"

—"মারা গেছেন না তোরা মেরে ফেলেছিস্?"

—"না বাবু, আমরা কিছু করিনি!" লোকটা মিনতির সুরে বলল।

—"ডাক্তার ঘোষ মারা গেলেন কিসে?"

—"আজ্ঞে যতীনবাবু আর তিনি শ্রাবণ মাসে একদিন পাহাড়ে বেড়াতে যান। তখন বর্ষাকাল, হঠাৎ ডাক্তারবাবু পা পিছলে একটা খাদের মধ্যে পড়ে যান। তাইতেই তিনি মারা যান। যতীনবাবু একা বাড়ী ফিরে এসে আমাকে খবর দিলেন। আমরা দুজনেই অনেককাল ধরে তাঁর কাছে ছিলুম, তাই দুজনেই ডাক্তারবাবুকে খুব ভালবাসতুম। এমন সময় এই লালগড়ের রাজা-বাহাদুরের একটা চিঠি যায় ডাক্তারবাবুর নামে। তাঁর সব চিঠিই যতীনবাবু খুলতেন। তাতে লেখা ছিল যে, রাজা-বাহাদুর ডাক্তারবাবুকে ভূতের কাজ করবার জন্য দু'লাখ টাকা দিতে চান। ঐ চিঠিই হলো কাল। যতীনবাবুর মাথায় শয়তান জেগে উঠল। তিনি ঠিক করলেন যে, তিনিই ডাক্তার-

সাহেব সেজে রাজা-বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করবেন। টাকার বখরা হলো আধা-আধি। প্রথমে আমার ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগেনি। কিন্তু যতীনবাবু বোঝালেন এতে কোন দোষ নেই। আমরা তো আর কারুর ক্ষতি করছি না!

এই ঠিক করে আমরা দুজন অনেক কষ্টে সেই খাদের ভিতর থেকে ডাক্তার সাহেবের দেহ এনে একটা জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে এলুম; কিন্তু বাইরের কাউকে জানানো হলো না যে ডাক্তারবাবু মারা গেছেন।

এদিকে যতীনবাবুর চেহারা অনেকটা ডাক্তার-সাহেবের মতই ছিল, কিন্তু তাঁর দাড়ি ছিল না। তাই প্রায় চার মাস যতীনবাবু বাড়ীর বার হলেন না—দাড়ি রাখলেন। আমার সঙ্গে ঠিক হলো, যতীনবাবু প্রথমে কলকাতায় গিয়ে রাজা-বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করবেন। তারপর প্রয়োজন বুঝে তাঁর বাড়ী লালগড়ে যাবেন। পরে আমাকে খবর দিলে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

যতীনবাবু তো চলে গেলেন; কিন্তু তার পরেই আমার আশঙ্কা হলো যে, যতীনবাবু যদি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন? এদিকে অনেক দিনের মধ্যে যতীনবাবুর কোন চিঠি না পেয়ে আমার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। যদি তিনি আমাকে সত্যিই ফাঁকি দেন, তাহলেই বা আমি কি করতে পারি? তাই ঠিক করলুম, লুকিয়ে যতীনবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করব, যাতে তিনি বুঝতে পারেন যে, আমি পিছনেই আছি, আমাকে এড়াতে পারবেন না।

সেই জন্যই আমি কাল রাত্রে গাছের উপর লুকিয়ে ছিলুম, যাতে যতীনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারি।"

সব শুনে বিজয়বাবু বিজয়-গর্ব্বে বলে উঠলেন, "এতক্ষণে তাহলে বোঝা গেল মণ্টুর হত্যাকারী কে!"

শশাঙ্ক ঈষৎ হেসে বলল, "কে!"

—"কেন, আমাদের এই জাল ডাক্তারবাবুটি! মণ্টুর কাছে হয়ত তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তাঁর পরীক্ষার সফলতার জন্য। পরে বোধহয় ভয় পেয়েছেন, যদি মণ্টু রাজা-বাহাদুরকে বলে দেয়!"

—"কিন্তু তাহলে ললিতকে হত্যা করল কে? আপনার ডাক্তার-সাহেব তো আমাদের সঙ্গেই এক গাড়ীতে এসেছেন। অথচ রমেশ-বাবুর মতে ললিত মারা গেছে কাল সন্ধ্যার আগে।"

বিজয়বাবু মাথা চুলকাতে লাগলেন।

শশাঙ্ক বলল, "আপনি ভোলাকে থানায় পাঠিয়ে দিন আর আজ সন্ধ্যার সময় আসবেন।"

বিজয়বাবু সম্মতি-সূচক ভাবে ঘাড় নেড়ে বিড়্ বিড়্ করে কি বললেন, বোঝা গেল না।

পনেরো

সন্ধ্যার সময় আজ আবার সবাই লাইব্রেরী-ঘরে সমবেত হলুম। আজ আর মণ্টু আমাদের মধ্যে নেই। সবার মনেই একটা ভয় এবং পরস্পরের প্রতি সন্দেহ। সবাই ভাবছে কে দোষী?

শশাঙ্ক আমাকে আর বিজয়বাবুকে আগে থাকতেই শিখিয়ে দিয়ে বলেছিল, "আজ আমি হব ডাক্তারের মিডিয়াম্। আমি যা বলব, খুব মন দিয়ে শুনবেন; কিন্তু নজর রাখবেন কেউ হঠাৎ উঠে পালাতে চায় কি না! পালাতে গেলেই জাপ্‌টে ধরবেন। তারপর আমি আছি।"

শশাঙ্ক ধীরভাবে গিয়ে মিডিয়ামের টুলের উপর বসল। ডাক্তার ঘোষকে অত্যন্ত বিমর্ষ এবং অস্থির মনে হতে লাগল। তিনি যে কি করবেন, তা যেন নিজেই ঠিক বুঝতে পারছেন না। তাহলেও তিনি শশাঙ্কের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ঘরের সবাই চুপ করে আছে। কালকের মতই একটা খুব অল্প পাওয়ারের নীল বাতি এক কোণে জ্বলতে লাগল। তার আলোতে সমস্ত ঘরটাই যেন কেমন রহস্যময় হয়ে উঠল! মনে হলো, যেন উজ্জ্বল চাঁদের আলো ঘরে এসে পড়েছে।

ডাক্তার ঘোষ তাঁর হাত দুটি শশাঙ্কের কপালের উপর বুলাতে-বুলাতে বললেন, "শরীরটা খুব আলগা করে দিন—ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়বেন, জেগে থাকবার চেষ্টা করবেন না।"

একটু পরে আবার বললেন, "শশাঙ্কবাবু, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?"

শশাঙ্ক নীরব। ডাক্তার ঘোষ আবার প্রশ্ন করলেন, "শশাঙ্কবাবু, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?"

শশাঙ্ক এবারেও নীরব। তার কিছুক্ষণ পরে আবার সেই প্রশ্ন। এবারেও প্রথমে শশাঙ্কের ঠোঁট দুটি একটু কেঁপে উঠল। তারপর সে আস্তে আস্তে বলল, "হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।"

শশাঙ্ককে কথা বলতে শুনে ডাক্তার ঘোষ নিজেই যেন একটু অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, "কে আপনার উপর ভর করে আপনাকে দিয়ে কথা বলাচ্ছে?"

শশাঙ্ক বলল, "আমি মণ্টু!"

আমরা সবাই যেন চমকে উঠলুম। ধরণীবাবু ফিস্-ফিস্ করে রজনীবাবুকে বললেন, "যত সব গাঁজাখুরি কাণ্ড!"

—"মণ্টুবাবু কি বলছেন?" ডাক্তার ঘোষ প্রশ্ন করলেন।

—"বলছি, সব বলছি। আমার সন্দেহ হয় যে রাণীমাকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকারীর মনে সন্দেহ হয় যে, আমি বোধহয় কে হত্যা করেছে তাও জানতে পেরেছি। তখন সে ঠিক করলো যে আমাকেও হত্যা করবে। তাই সে কাল রাতে আমি ঘুমুলে পরে আমার ঘরে আসে। সে এসে একটা শিশি থেকে তার রুমালের উপর ক্লোরোফর্‌ম ঢেলে আমার নাকের উপর চেপে ধরে। উঃ সে কি যন্ত্রণা! কিন্তু সে আমার মুখ চেপে ধরে ছিল, যাতে আমি শব্দ করতে না পারি। তারপর হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি যেন খুব হালকা হয়ে গেছি! বুঝলুম, একেই বলে মৃত্যু। তখন সে আমার দেহটা তুলে নিয়ে গেল।" এই বলে শশাঙ্ক একটু থামল।

তারপর আবার সে বলল, "সে যে শুধু আমাকেই হত্যা করেছে

তাই নয়, সে রাণীমাকেও খুন করেছে—ললিতও তার হাতে প্রাণ দিয়েছে।"

রাজা-বাহাদুর হঠাৎ পাগলের মত চীৎকার করে উঠলেন, "শশাঙ্ক! সে কে—কে সে?"

আমরা বুঝলুম চরম মুহূর্ত্ত আগতপ্রায়। উত্তেজনায় আমার বুক টিপ-টিপ করতে লাগল। আমি অত্যন্ত সতর্ক হয়ে রইলাম।

হঠাৎ সে আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠল, "বলছি—সে—সে হলো আমাদেরই—" শশাঙ্কের কথা আর শেষ হলো না।

হঠাৎ ধরণীবাবু উঠে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে আরম্ভ করলেন; কিন্তু আমি আর বিজয়বাবুও প্রস্তুত ছিলুম। সঙ্গে-সঙ্গেই তার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তাকে জাপটে ধরলুম। নিষ্ফল আক্রোশে তিনি গর্জ্জন করতে লাগলেন। এমন সময় কে যেন বড় বাতির সুইচটা টিপে দিলে, ঘর উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

রাজা-বাহাদুর অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, "শেষকালে ধরণীই—"

ধরা পড়ে ধরণীবাবুর চোখ দুটো হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলছিল। তিনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে শশাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই সব এক্সপেরিমেণ্টের তামাসা করবার কি দরকার ছিল?"

—"দরকার ছিল বৈকি!" শশাঙ্ক ধীর স্বরে বলল, "হ্যামলেটের মত আমি অভিনয় করতে চেয়েছিলুম। আমার আশা ছিল, আপনি এমন কিছু করবেন যাতে আপনি ধরা পড়ে যান। আমি নিখিল এবং বিজয়বাবুকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলুম যে, এরকম একটা নাটকীয় ব্যাপার ঘটতে পারে। আর ঘটলোও ঠিক তাই।"

ধরণীবাবুর চোখে দারুণ ঘৃণার ভাব ফুটে উঠল, তিনি বললেন,

"আমি জানতুম তোমার উপর কোন প্রেতাত্মাই ভর করেনি। তুমি অভিনয় করছিলে!"

—"তবু তো পালাতে চেষ্টা করেছিলেন! এটা হলো মানুষের সহজাত বৃত্তি। আপনি জানতেন আমি অভিনয় করছি; তবু পাছে আমি আপনার নাম বলি, এই ভয়ে আপনি আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না!"

—"তুমি কখন বুঝতে পেরেছিলে যে আমিই খুন করেছি?"

শশাঙ্ক আগের মতই অবিচলিত কণ্ঠে বলল, "প্রায় গোড়া থেকেই।"

—"বটে!"

শুনতে-শুনতে আমরা বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলুম। ধরণীবাবু হঠাৎ এক ঝাপটা মেরে আমাদের দু'জনকেই ছিটকে ফেলে দিয়ে দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

শশাঙ্ক চীৎকার করে উঠল, "পালাতে দিও না, ধরো, ধরো।" বলে সে নিজেও পিছনে-পিছনে ছুটল। আমরাও ওর পিছনে ছুটলুম। কিন্তু ধরণীবাবু আগেই ছাতের উপরে উঠে ছাতের দরজা বন্ধ করে দিলেন। পর-মুহূর্ত্তে ধপ্ করে একটা আওয়াজ হলো। মনে হলো, খুব উঁচু থেকে কি একটা ভারী জিনিষ পড়ল।

শশাঙ্ক নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "যাক্, আমাদের আর ছাতে যাবার দরকার নেই। রাস্কেলটা ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। এরপর যা কিছু করবার, সে ভার আপনার হাতে বিজয়বাবু!"

ষোলো

ঠিক করলুম, পরদিন সকাল আটটার গাড়ীতে আমরা ফিরে যাবো।

কুণাল বলল, "কি করে আপনি এই রহস্য ভেদ করলেন, শশাঙ্কবাবু?"

সবারই শুনবার আগ্রহ। রাজা-বাহাদুরও সায় দিলেন।

শশাঙ্ক বলল, "আমাদের আর বেশী সময় নেই। সংক্ষেপেই বলছি।" বলে একবার হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সুরু করল, "পরশু রাতে সেই পরীক্ষার পরেই যখন মণ্টু মারা গেল তখন পরিষ্কার বুঝতে পারলুম, রাণীমার হত্যাকারীই মণ্টুকে হত্যা করেছে।

মণ্টু যে সব কথা বলেছিল, তাতে হত্যাকারীর মনে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে মণ্টু হয়ত হত্যাকারীর নাম জানে, অন্তত আন্দাজ করতে পেরেছে! তাহলে রাণীমার হত্যাকারী মণ্টুর চাঞ্চল্যকর কথার পরেই স্থির করল মণ্টুকে হত্যা করবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই, হত্যাকারী কে হতে পারে?

রাণীমা হত হয়েছে আজ দশ বছর। তখন এই বাড়ীর কে কে এখানে ছিল যারা আজও উপস্থিত আছে? সবাই। কিন্তু সবাইএর তখন খুন করবার মত বয়স বা বুদ্ধি ছিল না। যেমন কুণাল, রজনীবাবু এবং সমর। তারা তিনজনেই তখন বালক। তাই বাকী থাকেন রাজা-বাহাদুর, পিসীমা এবং ধরণীবাবু। এখন এদের ভিতর থেকে বেছে নিতে হবে কে হত্যাকারী!

পিসীমার সঙ্গে অবশ্য রাণীমার মাঝে-মাঝে ঝগড়া হত। ধরে নিলুম যে, সেই ঝগড়ার ফলে তিনি খুন করলেন; কিন্তু একা-একা গর্ত্ত খুঁড়ে মৃতদেহ চাপা দিয়ে সিমেণ্ট করে দেওয়া, তাঁর মত ক্ষীণস্বাস্থ্য লোকের পক্ষে অসম্ভবই। তবু পিসীমার কথা একেবারে বাদ দিলুম না। কারণ, তাঁর ছেলে সমরকে পোষ্য না নিয়ে মণ্টুকে পোষ্য নেওয়ায় তাঁর খুব রাগ হয়েছিল।

তারপর রাজা-বাহাদুর। তিনি অবশ্য মণ্টুকে খুন করতে পারেন! কিন্তু তিনি যে রাণীমাকে খুন করেননি তা' নিশ্চয়; কারণ, তিনি তখন এখানেই ছিলেন না। হয়ত কুণাল ফিরে আসায় তিনি হঠকারিতাবশতঃ দত্তক নেবার জন্য মনে-মনে অনুশোচনা করছিলেন। হয়ত সমস্ত সম্পত্তি কুণালকে দেবার জন্য তিনি মণ্টুকে খুন করেছেন। কিন্তু এর একটা প্রবল আপত্তি আছে। সে হলো কুণালের মার চিঠিখানা—যেখানা মণ্টুর কাছ থেকে কুণাল পায়। তাতে রাণীমা লিখেছিলেন যে, 'তোমাদের বংশের প্রত্যেকটি লোকের রক্তেই হত্যার বীজ লুকিয়ে আছে।'

এখানে কথা হচ্ছে, তিনি কাকে লক্ষ্য করে এই চিঠি রাজা-বাহাদুরকে লিখেছিলেন? তিনি যে খুবই ভয় পেয়েছিলেন তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু ভয় পেয়েছিলেন কার ব্যবহারে? রাজা-বাহাদুরের ব্যবহারে যদি হত, তবে তিনি তাঁকে জানাতে যাবেন কেন? তাঁর সম্ভবতঃ ইচ্ছা ছিল তিনি রাজা-বাহাদুরকে বোঝাবেন, কার মনে হত্যার প্রবৃত্তি আছে। সেই জন্য তিনি 'বংশের প্রত্যেক লোক' এই কথা লিখেছিলেন। তাছাড়া, আরও একটা দিক দেখবার আছে।

রাণীমা চাকর-বাকরের কাছে এই বংশের প্রবৃত্তির কথা শুনেছেন অনেকদিন, অথচ এ কথা আগে একদিনও রাজা-বাহাদুরকে জানাননি। জানালেন চিঠিতে এবং কখন? যখন রাজা-বাহাদুর কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় গেছেন। এর এক কারণ হতে পারে যে, তিনি কথাটা সামনা-সামনি তাঁকে বলতে সাহস পাচ্ছিলেন না।

এর তো আরও একটা কারণ হতে পারে! হয়ত রাজা-বাহাদুর কলকাতা যাবার পরে এমন কিছু ঘটেছে যাতে হঠাৎ তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, এ-বংশের লোক খুন করতে পারে! দেখা যাক্ রাজা-বাহাদুর চলে যাবার পরে কি এমন বিশেষ ঘটনা ঘটেছে যাতে রাণীমা-ভয় পেলেন!

একমাত্র ঘটনা দেখা যাচ্ছে—একজন লোক আপাদ-মস্তক শাল দিয়ে ঢেকে গাড়ীতে করে রাজবাড়ী এসেছিল। সবার বিশ্বাস, ইনি রাণীমার ভাই। কিন্তু তিনি যদি ভাই হন, তাহলে তিনি হত্যাকারী নন। কারণ, পরশু সন্ধ্যায় রাণীমার ভাই উপস্থিত ছিলেন না, অথচ আমরা বলেছি যে সে-সময় রাণীমার হত্যাকারী উপস্থিত ছিল।

তাহলে ব্যাপার দাঁড়াল এই যে, যিনি রাণীমার ভাই বলে অনেকের বিশ্বাস, তিনি রাণীমার ভাই নন—এই বংশেরই কেউ। রাণীমার ভাই হলে তিনি কখনও ওরকম লুকিয়ে আসতেন না। যদি এই বংশেরই কেউ হয়, তবে সে কে হতে পারে? একমাত্র ধরণী-বাবু। এবং হয়ত তাঁরই ব্যবহারে রাণীমার সন্দেহ হয় যে, তিনি হয়ত তাঁকে খুন করতে পারেন।

এখানে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। রাজা-বাহাদুর বলেছেন যে, ধরণী প্রায়ই এসে রাণীমাকে উত্ত্যক্ত করে তাঁর কাছ থেকে

টাকা নিয়ে যেত। রাণীমা তাতে অত্যন্ত বিরক্ত হতেন; কিন্তু রাজা-বাহাদুর ধরণীবাবুকে অত্যন্ত ভালবাসতেন বলে তিনি শেষ পর্যন্ত টাকা দিতেন। হয়ত ধরণীবাবু এই টাকা না পেয়েই রাণীমাকে রাগের বশে খুন করেছেন।

সব দিক ভেবে দেখলে পিসীমা, রাজা-বাহাদুর এবং ধরণীবাবুর মধ্যে ধরণীবাবুরই হত্যাকারী হবার সম্ভাবনা বেশী। তাই আমার সন্দেহ পড়ল তাঁর উপর। এদিকে কয়েকটা সামান্য ব্যাপারে আমার এই সন্দেহ দৃঢ় হলো।

প্রথমেই দেখলুম ললিতের পাশবই। দীর্ঘকাল ধরে ললিত টাকা জমা দিচ্ছে—কিন্তু মাসে মাত্র দু-তিন টাকা করে। কিন্তু গত মাস-চারেক ধরে হঠাৎ তার জমার অঙ্ক বেড়ে গেল অসম্ভব রকমে! এত টাকা হঠাৎ সে কোথায় পেল? নিশ্চয়ই কাউকে ব্ল্যাক্‌মেল্ করে অর্থাৎ ভয় দেখিয়ে! কিন্তু একটা মজার ব্যাপার এই যে, রাজা-বাহাদুর আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেন ধরণীবাবু মাত্র মাস-চারেক হলো যাভা থেকে এসেছেন তাহলে দেখা যাচ্ছে, ধরণীবাবুও এলেন আর ললিতের টাকার অঙ্কও বেড়ে যেতে লাগল! কিন্তু এখানে প্রশ্ন হতে পারে, ললিত যদি ধরণীবাবুকে ভয় দেখিয়েই টাকা আদায় করে থাকে, তবে সে নিশ্চয়ই ধরণীবাবুর অপরাধের কথা জানত। কিন্তু কেমন করে? এখানে ডাক্তার ঘোষ আমাদের সাহায্য করেছেন।

তিনি বলেছেন যে, মণ্টু যখন রাজা-বাহাদুরের হয়ে কলকাতায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যায়, তখন সে তাঁকে বলেছিল তাঁর সন্দেহের কথা। সে বলেছিল যে, তার সন্দেহ হয় রাণীমাকে কেউ খুন করেছে এবং এই সন্দেহের কথা সে ললিতের কাছে নাকি প্রকাশ করেছিল।

ললিত চালাক লোক। সে সব রকম ঘটনা মিলিয়ে আন্দাজ করেছিল যে, ধরণীবাবুই হত্যাকারী। কাজেই ধরণীবাবুর পক্ষে ললিতকে বেশীদিন বাঁচতে দেওয়া উচিত নয়। মণ্টুকে কিন্তু ললিত তার সন্দেহের কথা বলেনি। কারণ, বললে সে হত্যাকারী বার করবার জন্য এক্সপেরিমেন্টের সাহায্য নিত না।

এদিকে পরশু সন্ধ্যার আগে পর্য্যন্ত ধরণীবাবুর মনে বিশ্বাস ছিল যে, মণ্টু এসব কিছু জানে না। যাহোক, ধরণীবাবু ঠিক করলেন ললিতকে সরাতেই হবে।

ললিত যখন পরশু সন্ধ্যাবেলায় গাড়ী নিয়ে বেরোয়, তার আগেই তিনি গাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন। ললিত গাড়ীতে ঢুকবার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি পিছন থেকে হাতুড়ী দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে তাকে অজ্ঞান করে ফেলেন। তারপর শেষ করেন ক্লোরোফর্মের সাহায্যে। তারপর নিজেই তার কোট এবং টুপি পরে ললিতের দেহ গাড়ীতে নিয়ে হালদার-বাগানে গিয়ে হাজির হন।

আমি যখন রাজা-বাহাদুরের বাগানের মধ্যে গাড়ীটা দেখতে পাই তখনই তার চাকায় হাত দিয়ে কয়েক টুক্‌রা পাথরের কুচি পেয়েছিলুম। তাতেই আমার সন্দেহ হয় যে, গাড়ী নিশ্চয়ই ওইরকম পাথর ছাওয়া পথে গিয়েছিল। কুনালের কাছ থেকে জানতে পারি যে, ঐরকম পথ একমাত্র হালদার-বাগানে আছে। সেই মত আমরা হালদার-বাগানে উপস্থিত হয়ে একটা ভাঙ্গা ইদারার মধ্যে থেকে ললিতের মৃতদেহ উদ্ধার করি। তাছাড়া, টুপির মধ্যে আমি জবাকুসুম তেলের গন্ধ পেয়েছিলুম। ধরণীবাবু জবাকুসুম তেল ব্যবহার করতেন।

এদিকে ডাক্তার ঘোষের এক্সপেরিমেন্টের পরে ধরণীবাবুর সন্দেহ হলো যে মণ্টুও হয়ত তাঁর অপরাধের কথা জানে! তাই তিনি ঠিক করলেন মণ্টুকেও দূর করা দরকার। পিসীমা যখন বাথরুমে ছিলেন তখনই ধরণীবাবু তাঁর ঘর থেকে ক্লোরোফর্ম চুরি করেছিলেন। তারই খানিকটা ব্যবহার করেছিলেন ললিতের জন্য, বাকীটা কাজে লাগল মণ্টুর জন্য।

মণ্টু ঘুমিয়ে পড়লে তিনি তার ঘরে ঢুকেন। তারপর একটা রুমালে ক্লোরোফর্ম ঢেলে তার নাকের উপর চেপে ধরেন যতক্ষণ না সে মারা যায়। তখন তাঁর কাজ হলো, ক্লোরোফর্মের শিশিটা নষ্ট করা। তিনি অবশ্য বাইরে ফেলে দিতে পারতেন জানলা দিয়ে; কিন্তু তাতে কুড়িয়ে পাবার সম্ভাবনা ছিল।

তাই তিনি শিশিটা একটা তোয়ালে জড়িয়ে, পায়ে মাড়িয়ে গুঁড়ো করে ফেলেন এবং গুঁড়োগুলো ওয়াশ-বেসিনে ফেলে জল ঢেলে দেন। দু-একটা কাচের টুক্‌রো আমরা তোয়ালে এবং ওয়াশ-বেসিনে দেখতে পেয়েছিলুম।

তারপর তাঁর চিন্তা হলো, মৃতদেহ কোথায় রাখবেন? ওইখানে থাকবে, না অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলবেন? তখন তিনি একটা অসমসাহসিক কাজে হাত দিলেন।

তিনি জানতেন খুন করে খুনী সর্ব্বত্রই মৃতদেহ দূরে সরিয়ে দিতে চায়। এই হলো স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তিনি তাই নিজের উপরে যাতে সন্দেহ না পড়ে তার জন্য ঠিক করলেন, মণ্টুর মৃতদেহ নিজের বিছানায়ই রেখে ঘুমুবেন; কিন্তু মনের মধ্যে এইরকম একটা অপরাধের ভার নিয়ে এবং বিছানায় মৃতদেহ রেখে ঘুমান অসম্ভব। তাই

তিনি জোর করে ঘুম আনবার জন্য মর্ফিন ট্যাবলেট খেলেন। তার মোড়কগুলিও আমরা পেয়েছি। তিনি তখন মণ্টুর মৃতদেহ নিজের ঘরে বয়ে নিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

এই উপলক্ষ্যে রাজা-বাহাদুরের কাছে আমার একটা বক্তব্য আছে। ডাক্তার ঘোষের কথায় আমার মনে হয়েছে তিনি আর প্রেততত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করবেন না। কি বলেন ডাক্তার ঘোষ, তাই নয়?"

ডাক্তার ঘোষ আমতা-আমতা করে বললেন, "তা ঠিক। কোন গবেষণাগার করতে গেলেই সংসারে জড়িয়ে পড়তে হবে। আমি চাই আমার বাকী জীবনটা একটু নিরালায় কাটিয়ে দিতে।"

রাজা-বাহাদুরের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল; কিন্তু কি ভেবে তিনি চুপ করেই রইলেন।

শশাঙ্ক হঠাৎ হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, "আর দেরী করলে গাড়ী পাবো না।" বলেই উঠে দাঁড়াল।

রাজা-বাহাদুর এবং কুণাল দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

পথে নেমেই আমি শশাঙ্ককে প্রশ্ন করলুম, "ডাক্তার ঘোষকে তুমি এমন কৌশলে বাঁচিয়ে দিলে কেন?"

মৃদু হেসে শশাঙ্ক বলল, "ছেড়ে দিয়েই তাঁর সবচেয়ে বড় উপকার করা হলো। বিজয়বাবুকে বলেছি ভোলাকেও ছেড়ে দিতে। একটা কথা ভুলো না নিখিল, সংশোধন হয় শাস্তিতে নয়, ক্ষমায়।"

তারপর একটু হেসে বলল, "একটু পা চালিয়ে চল। সওয়া আটটা হলো।"

—শেষ—